ত্রৈমাসিক কৃষি পত্রিকা
৬৪ বর্ষ - প্রথম সংখ্যা
বৈশাখ - আষাঢ় ১৪৩৩ • April-June '26

সার সমাচার

দি ফার্টিলাইজার এ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া
(পূর্বাঞ্চলীয় কমিটি), ৩ কবি ভারতী সরণী
কলকাতা - ৭০০ ০২৯
ফোন ঃ ২৪৬৩-৮২৫৬
ই-মেল ঃ faicalcutta@gmail.com

সম্পাদক
শ্রী সুবোধ কুমার সিং

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
শ্রী প্রদীপকুমার বটব্যাল

সম্পাদকমণ্ডলী
শ্রী রাজবীর সিং (সভাপতি)
শ্রী লক্ষ্মীকান্ত জানা
ডঃ নিত্যানন্দ ত্রিবেদী
ডঃ শুভেন্দুদেব চট্টোপাধ্যায়
ডঃ প্রকাশ দত্ত
ডঃ প্রদীপ সেন

প্রচার ও বিজ্ঞাপন সহযোগী - **শ্রী সঞ্জয় দাস**

লেখকের মতামত সকল ক্ষেত্রেই
'দি ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়ার'
মতামত নহে।

এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ অথবা সংবাদ পুর্নমুদ্রণে বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন নাই। তবে প্রাপ্তি স্বীকৃতি আবশ্যক।
বার্ষিক চাঁদা ডাক মাশুল সমেত ১৪০.০০ টাকা।
বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।
মানি অর্ডার যোগে চাঁদা পাঠাতে হবে।

দি ফার্টিলাইজার এ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়ার
পূর্বাঞ্চলীয় কমিটির দ্বারা ৩, কবি ভারতী সরণী
কলকাতা - ৭০০ ০২৯ হইতে প্রচারিত
ফোন ঃ ২৪৬৩-৮২৫৬

এই সংখ্যায় আছে

সম্পাদকীয়...

একই সাথে দুই ফসলের চাষ - জল জমানো জমির ধানে বস্তায় লাগিয়ে, মাচায় তুলে লতানে সবজির চাষ ৭
চন্দন দে, তকবীর আলী, কৌশিক ব্রহ্মচারী, রাজীব কুণ্ডু, সুকমল সরকার, রূপক গোস্বামী, মোহাম্মদ মাইনউদ্দিন

পশ্চিমবঙ্গে লঙ্কাচাষ বৃদ্ধির সম্ভাবনা ২০
ঋষিকৃষ্ণ দে

Xa জিনের জ্যাকেট মোড়া ধান - জীবাণু ধসার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানীদের সবুজ অভিযান ২৩
ড. শুভেন্দু দেব চ্যাটার্জী

চুকাই বা রোজেলা সম্ভাবনাময় অর্থকরী ফসল ২৭
ডঃ সমরেন্দ্র নাথ খাঁড়া

সুগন্ধি 'রাধাতিলক' ধানের নিবন্ধীকরণ, উৎপাদন ও বিপণন ২৯
ড. মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, ড. অমিতাভ বিশ্বাস, ড. তাপস বিশ্বাস, ড. শিবাজী ব্যানার্জী, ড. সুতনু সরকার, ড. প্রণব দেবনাথ, ড. সঞ্জয় কুমার বরদলুই, ড. কিংশুক ঢালি, ড. ঝুমা দত্ত, ড. শঙ্খজিৎ রায়, সুচেতন চক্রবর্তী, কাব্যিয়াসেলভান ভি., শ্রীপ্রিয়া দাস, মৈনাক সরকার, অয়ন বাগ, ইলোরা বাগ, সুদীপ্ত সরকার, সৌমী সাহা, সবুজ পতি, তরুণ সরকার, গৌতম গাঙ্গুলী, রহিদুল মণ্ডল ও শৈবাল রায়

সুন্দরবনে গভীর জলের ধান চাষ ৪১
ড. অনুপম পাল

টেকসই কৃষি পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য সময়ে দাবি ৪৬
বলবন্ত সিং

কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ভারতীয় অর্থনীতির সুদৃঢ়ীকরণ ৪৭
অনিন্দিতা কর্মকার এবং স্মৃতিকণা সরকার

সম্পাদকীয়

স্বাভাবিক নিয়েমে জনসংখ্যার বৃদ্ধির জন্য খাদ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা যায় এবং খাদ্য শস্য, কৃষি উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি করে যেতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন উন্নত কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং তার প্রয়োগ। সবচেয়ে আগে আমাদের মাটি অর্থাৎ যেখানে ফসল উৎপাদন হয় তার স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিতে হবে। মাটি থেকে শস্য উৎপাদনের মাধ্যমে যে উদ্ভিদপুষ্টি উপাদান তুলে (**Nutrient mining**) নেওয়া হচ্ছে। তা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। নিবিড় চাষের ফলে অর্থাৎ দো ফসলী বা তিন ফসলী জমি হতে অতি দ্রুত মাটিতে সঞ্চিত খাদ্য উপাদান নিঃশেষিত হতে থাকে। তা পূরণ করার জন্য রাসায়নিক সারের সাথে গৌণ খাদ্য উপাদান, অণুখাদ্য, কম্পোস্ট বা জৈব সার, জীবাণু সার, মাটি সংশোধন এই সব কিছুর সুসংহত প্রয়োগ করা হলে তবেই উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা করাও সম্ভব।

মাটি একটি জৈব ও অজৈব পদার্থের অসমসত্ব মিশ্রণ। মাটিতে ৫০% খনিজ ও জৈব পদার্থ, ২৫% জল ও ২৫% বাতাস থাকে। মাটি থেকে উদ্ভিদ প্রায় ১৮টি খাদ্য উপাদান (**Nutrient**) গ্রহণ করে। এছাড়া হিউমিক এ্যাসিড, কার্বলিক অ্যাসিড, ছত্রাক, ব্যাক্টেরিয়া মাটিতে উপস্থিত থাকার ফলে উদ্ভিদের খাদ্য গ্রহণে সহায়তা করে। গাছের প্রধান তিনটি খাদ্য উপাদান নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশের উদ্ভিদ কর্তৃক গ্রহণ যোগ্যতা সমান নয়। নাইট্রোজেনের ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ গাছ গ্রহণ করতে পারে। ফসফরাস ও পটাশের ১৫ থেকে ২০ শতাংশ গাছ নিতে পারে। খাদ্য উপাদানের গ্রহণ যোগ্যতা অনেক অংশেই নির্ভর করে মাটিতে উপস্থিত জৈব পদার্থের পরিমানের উপর। মাটিতে উপস্থিত বিশেষ ধরণের উপকারী ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া অথবা মাইকোরাইজা এই সমস্ত উপকারী জীবাণু মাটিতে বা গাছের শিকড়ে বাস করে ও গাছকে আর প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে।

সর্বপরি বলা যায় ভারতীয় কৃষির অনেক গুলি পরিপন্থির মধ্যে আছে মনশুনের অনিশ্চিয়তা, বৈজ্ঞানিক প্রথায় এখনও বেশীর ভাগ চাষ না হওয়া ও ছোট ছোট প্লটে জমির চাষ, জমির উৎকর্ষতার ক্রমাবনতী অর্থাৎ জমির উর্বরতার অবনতি, সেচের সুব্যবস্থা না থাকা, কৃষি যন্ত্রপাতির সুষ্ঠ ব্যবহার না করা, কৃষিতে প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থনিবেশ না হওয়া, সময়মত ফসলের রোগ পোকা দমনের ব্যবস্থা না থাকা, এবং কৃষি উৎপাদনের সুষ্ঠ পরিবহন ব্যবস্থার অভাব। এই সকল কারণে কৃষির উন্নতি ও অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। এই সব সমস্যার সমাধানের সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে। তবেই ভারতীয় কৃষি আমাদের অর্থ নীতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হবে।

FAI-Eastern Region National Seminar on – 15th April 2026

Dr. Ashok Kumar Patra lighting the lamp at the inaugural session.
Other seen in the picture (L-R) Dr. Soumitra Das, Dr. Rahul Mirchandani, Mr. U.C. Dixit, Dr. Suresh Kumar Chaudhari, Mr. Subodh Kumar Singh and Dr. Biswarup Bose

FAI-Eastern Region National Seminar on
'Micronutrients & Specialty Fertilizers' – 15th April 2026 (Wednesday)
at ITC Royal Bengal, Kolkata

একই সাথে দুই ফসলের চাষ - জল জমানো জমির ধানে বস্তায় লাগিয়ে, মাচায় তুলে লতানে সবজির চাষ

চন্দন দে, গবেষক; **তকবীর আলী**, গবেষক; **কৌশিক ব্রহ্মচারী**, অধ্যাপক; **রাজীব কুণ্ডু**, সহকারী অধ্যাপক
শস্যতত্ত্ব বিভাগ, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
সুকমল সরকার, সহকারী অধ্যাপক; **রূপক গোস্বামী**, সহযোগী অধ্যাপক
রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ এডুকেশনাল এণ্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট
মোহাম্মদ মাইনউদ্দিন, বরিষ্ঠ প্রধান গবেষণা বিজ্ঞানী
কমনওয়েলথ সাইন্টিফিক এণ্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ অর্গানাইজেশন, অস্ট্রেলীয়া

ধান — এপার, ওপার দুই বাংলার মূল মেঠো ফসল। এরাজ্যের পাশাপাশি দেশের বাকি সব রাজ্যেও এর চাষ-ব্যাপ্তি বিপুল বললেও ভুল হবেনা। আমাদের রাজ্যের সিংহভাগ কৃষকেরই জীবিকা নির্বাহের মূল হাতিয়ার হলো ধানচাষ। একটু অন্যভাবে বললে বলতে হয় 'ধান' আর 'চাষাবাদ' তাদের কাছে প্রায় সমার্থক। কিন্তু গত কয়েক দশকে সার-বীজ-সেচ-রোগ পোকার ওষুধের খাতে খরচ লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে চাষের মাঠে। ধান বিক্রির সরকারি ব্যবস্থাপনা অবশ্যই বিদ্যমান এরাজ্যে, কিন্তু সব মিলিয়ে অধিক মুনাফার মুখ দেখার ইচ্ছা আজও সব কৃষকের মনে উঁকি মারে। হ্যাঁ, অধিক আয়, অধিক লাভ কে না চায়! এছাড়া, বর্ষা ও অন্যান্য ঋতুর খামখেয়ালিপনা বছরে বেশ কয়েকবার কৃষকের কপালে ভাঁজ ফেলে। বর্ষার ধানে বীজতলাতে জলের যোগান সম্ভব হলেও মূল জমিতে ধান চারা রোপণের আগে জমি কাদা করার সময় জলের সংকট দেখা যায় ফি-বছর। সনাতনী বর্ষাসূচির বদলই এমনটা ঘটায় রাজ্যের বিভিন্ন ধান উৎপাদনকারী এলাকায়। বোরো মরসুমে ভূপৃষ্ঠের ওপরে জমানো জলে ধান চাষ করা আজ সত্যিই দুষ্কর। ফলে ভূনিম্নস্থ জল তুলে হাজার হাজার হেক্টর জমিতে বোরো ধান আবাদ করে

আমরা ক্রমশই পরিবেশে ডেকে এনেছি ভারসাম্যহীনতা। পাশাপাশি ডেকে এনেছি আর্সেনিক দূষণের মতো নানান বিপর্যয়কে। আবার ভারতের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করে উৎপাদন বাড়ানো প্রায় অসম্ভব। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রতি একক জমিতে একক সময়ে উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত কৃষি-প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। এসব নানান দিক বিশ্লেষণ করে রাজ্যের মূল মেঠো ফসল ধানের চাষকে আরও বেশি লাভজনক, স্থিতিশীল ও পরিবেশবান্ধব করে তুলতে কৃষি বিজ্ঞানীরা আজ হরেক কিসিম প্রকৌশলের হদিশ দিচ্ছেন। কৃষি বিজ্ঞানমুখী এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ও এমনই একটি প্রকৌশল।

ভারতের মোট ধান চাষের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এলাকা নিচু জমির আওতায়, যেসব জমিতে দীর্ঘসময় ধরে জল দাঁড় করিয়ে রাখতে হয়। বর্ষাকালে অনিয়মিত বৃষ্টিপাত ও অতিবৃষ্টিজনিত জলমগ্নতা এই অঞ্চলের স্বাভাবিক জলছবি। এই পরিস্থিতিতে কৃষকরা ঐতিহ্যগতভাবে নিচুজমিতেই ধান চাষ করে থাকেন। ধানের জীবদ্দশার প্রায় সম্পূর্ণ সময় ধরেই যেহেতু জমিতে জল জমিয়ে রাখতে হয় সেই কারণে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, যে মরসুমেই ধান চাষ হোক না কেন সেই মাঠে অন্য কোনো সাথী ফসল চাষ করা সম্ভব হয় না। সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জল জমানো ধানের জমিতে কোনও সাথী ফসলের চাষ করে অবশ্যই অতিরিক্ত আয়ের আলো দেখানো যেতে পারে কৃষিজীবী পরিবারগুলোকে। সেক্ষেত্রে একক জমিতে উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ যেমন বাড়ানো যায় অর্থাৎ খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয় তেমনই পুষ্টি নিরাপত্তার পথও প্রশস্থ হয়। কারণ টাটকা সবজি খাদ্যআঁশ, ভিটামিন ও

খনিজ পদার্থে ভরপুর। জমানো-জলে চাষ-করা ধানের জমিতে বস্তায় সবজি চাষ এমনই এক বিকল্প কৃষি প্রকৌশল।

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দেশ ও বিদেশের নানা প্রকল্পের কর্মসূচি হিসেবে নদীয়া জেলার গয়েশপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবন এলাকার অসংখ্য কৃষিজীবী পরিবারের বাস্তুজমিতে ও আবাদী জমিতে ধানের সাথে বস্তায় লাগিয়ে ও মাচায় তুলে নানান লতানে সবজির চাষ শুরু করেছে। এমনকি শষ্য-চক্র মেনে-চলা জমিগুলোতে শুরু করেছে ধান-পরবর্তী কোনো রবি ফসলের সাথে শীতকালীন লতানে সবজির চাষ - অবশ্যই মাচায় তুলে। খরিফ মরসুমে ধান এই সব শষ্য পর্যায়ের প্রধান ফসল, কাদানো জমির ধান উঠলে না-চষা জমিতে কাটা ও ঝাড়া ধানের খড় বিছিয়ে আলুর চাষ অথবা বিনা কর্ষণে সর্ষে কিংবা মুসুরির চাষ হলো পরবর্তী শীতকালীন ফসল। লতিয়ে ওঠা বিভিন্ন সবজি ফসলের মধ্যে বর্ষাকালে লাউ অথবা শশা এবং শীতকালে মিষ্টি কুমড়ো অথবা উচ্ছে

বেশ ভালোরকম লাভের মুখ দেখাচ্ছে কৃষকদের। বহুস্তরীয় এই চাষ পদ্ধতি উৎপাদন বৃদ্ধির একটি কার্যকর ও সম্পদ-সাশ্রয়ী উপায় হিসেবে গুরুত্ব পাচ্ছে দিনকেদিন। বিশেষ করে বস্তা-মাচা পদ্ধতি একই জমিতে উল্লম্বভাবে ফসল চাষের সুযোগ সৃষ্টি করে, যার মাধ্যমে জমি, জল, আলো ও পুষ্টি উপাদানের সর্বোত্তম ব্যবহার সম্ভব হয় এবং প্রতি একক জমিতে মোট জৈব উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বর্ষাকালে উপযুক্ত উঁচু ও মাঝারি জমির অভাবে সবজি চাষ সীমিত হয়ে পড়ে, ফলে জুন থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যের সময়টায় চাহিদা ও জোগানের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবদান তৈরি হয়। এই সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য ধানক্ষেতে আবদ্ধ জলের উপর ফাঁকা বায়বীর স্থানকে কাজে লাগিয়ে বস্তায় লতানো সবজি চাষ বেশ লাভজনক হয়ে উঠতে পারে। এই পদ্ধতিতে মাচার মাধ্যমে লতানে ফসলকে উপরে তোলা হয়, ফলে মাটির সংস্পর্শ কমে এবং রোগ-পোকার আক্রমণও তুলনামূলকভাবে হ্রাস পায়।

বস্তা-মাচা পদ্ধতি (Sack-Trellis System) কি?

বস্তা-মাচা পদ্ধতি হলো একটি জলবায়ু-সহনশীল, বহুস্তরবিশিষ্ট, স্বল্প খরচের চাষ পদ্ধতি, যেখানে ধানক্ষেতে উঁচু স্থানকে কাজে লাগিয়ে সবজি উৎপাদন করা হয়। একে অনেকসময় কলাম চাষও (column cultivation) বলে। এই পদ্ধতিতে মাটি ও সার মিশ্রিত বস্তায় লতানে সবজির চারা রোপণ করা হয় এবং বস্তাগুলিকে সাধারণত ধানক্ষেতের আল বা উঁচু স্থানে রাখা হয়। লতাগুলোকে প্রায় ৬ ফুট উঁচুতে নির্মিত মাচার ওপর উঠিয়ে ধানের উপরের বায়বীয় স্থান সঠিকভাবে কাজে লাগানো হয়। এই পদ্ধতিতে লাউ, শসা, ঝিঙে, চিচিঙ্গা, উচ্ছে প্রভৃতি বর্ষাকালীন সবজি সহজেই চাষ করা সম্ভব এবং ধানের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে কোনো বিঘ্ন ঘটে না। জৈব সার ও মাটির মিশ্রণে তৈরি এবং বস্তায় আবদ্ধ কলামে সবজির বীজ বপন বা চারা রোপণের পর লকলকে লতানে ডগা ধানের জমির উপরে তৈরি করা মাচায় তুলে উপযুক্ত পরিচর্যা করা - এটাই এই কৃষি প্রযুক্তির সুচারু ক্রিয়াকৌশল। এর মাধ্যমে একই জমিতে একযোগে ধান ও সবজি উৎপাদন করা যায়, যা ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি, কৃষকের অতিরিক্ত আয় নিশ্চিত করে এবং বন্যাপ্রবণ নিচু জমির ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচায়।

কত প্রকারে মাচা?

অনুভূমিক মাচা (Horizontal trellis)

ধানের উপরে বাঁশের ও জালের দ্বারা মাচা তৈরি করা হয় যাতে লতাগুলো মাচা বরাবর ভালোভাবে বিস্তার করতে পারে।

অন্তর্বর্তী মাচা (Skip trellis)

এই পদ্ধতিতে জমির পুরো অংশে মাচা না বানিয়ে কয়েক ফুট ধান লাগিয়ে কিছু অংশ ছাড়া হয়; সেই অংশে বানানো হয় মাচা। মাচার পরে আবার লাগানো হয় ধান - গোটা জমিতেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এতে খরচ কম হয়, আবার গাছের জন্য উপযুক্ত বায়ু চলাচল বজায় থাকে।

উলম্ব মাচা (Vertical trellis)

এই পদ্ধতিতে বাঁশ ও জালের কাঠামোটি জমির আল বরাবর উলম্বভাবে বানানো হয়। লতা গুলোকে দড়ি, তার বা জালের সাহায্যে উপরের দিকে উঠতে দেওয়া হয়। এতে জমির উপরিভাগ ফাঁকা থাকে, ফলে ধান এর প্রয়োজনীয় সূর্যকিরণের কোনোরূপ ব্যাঘাত ঘটেনা।

কিভাবে মাচা বানাবেন?

ধান রোপণের ১০-১৫ দিন পর আলের মাটি/জমা-জলের নিচের মাটি কিছুটা শক্ত হলে মাচা তৈরির কাজ শুরু করতে হবে। বাড়িতে পড়ে থাকা অথবা আশপাশের এলাকায় সস্তায় পাওয়া যায় এমন বাঁশ বা কাঠ দিয়ে জমিতে ৬ - ৭ ফুট অন্তর অন্তর খুঁটি পুঁততে হবে। মাচার উচ্চতা প্রায় ৬ ফুট রাখা উচিত যাতে নিচের ফসলে সব ঋতুতেই সহজেই অন্তর্বর্তী পরিচর্যা করা যায়। মাচাকে শক্তপোক্ত করার জন্য প্রয়োজনে দড়ি দিয়ে টান দিতে হবে, যাতে ঝড়-ঝঞ্ঝার সময় এটি নিচের ফসলের ওপর ভেঙে না পড়ে। পাশাপাশি, লতানে সবজির সঠিক বিস্তারের জন্য মাচার ওপর জাল বিছিয়ে দেওয়াই সমীচীন।

কিভাবে বস্তার মাটি বানাবেন?

কাছাকাছি এলাকা থেকে চাল, চিনি বা সারের ৫০ কেজি মাপের খালি বস্তা সংগ্রহ করতে হবে এবং বর্ষার শুরুতে প্রতিটি বস্তায় প্রায় ৪০ কেজি শুকনো মাটি ও ১০ কেজি জৈব সার ভালোভাবে মিশিয়ে ভরতে হবে। অতিরিক্ত জল নিষ্কাশনের জন্য বস্তার নিচের অংশে গা-বরাবর ৩/৪টে ছোট ছিদ্র করে দিতে হবে, যাতে বৃষ্টির জল জমে না থাকে। এইভাবে মাটি তৈরি করার পর চারা রোপণের আগে পর্যন্ত বস্তাগুলোকে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখা উচিত, যাতে অতিরিক্ত রোদে মিশ্রণ শুকিয়ে না যায় বা বৃষ্টিতে মাটি ধুয়ে যাবার ফলে গাছের পুষ্টি উপাদান নষ্ট না হয়।

ধান-জমিতে কতটা দূরত্বে বস্তা রাখবেন?

ধানক্ষেতে সাথী ফসল হিসাবে সবজি চাষের ক্ষেত্রে সঠিক দূরত্ব বজায়

রাখা অত্যন্ত জরুরি, যেন অতিরিক্ত ছায়া পড়ে ধানের বৃদ্ধি ব্যাহত না হয় এবং ধান গাছ পর্যাপ্ত আলো পেতে পারে। লতানে সবজির বিস্তার ও মাচার উপর বৃদ্ধির ধরন অনুযায়ী গাছের সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে এবং সাধারণত প্রতি হেক্টরে (৭.৫ বিঘা) গড়ে ২৫০০ - ৩০০০টি গাছ রাখা উপযুক্ত। এ জন্য মাটি ও জৈব সার মিশ্রিত বস্তা ধানের জমির আল, উঁচু জায়গা বা প্রয়োজনে জলাবদ্ধ জমির মধ্যেও স্থাপন করা যায়, তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখা আবশ্যক। সঠিক দূরত্ব বজায় রাখলে জমিতে বায়ু চলাচল বৃদ্ধি পায়, আর্দ্রতা কম থাকে এবং এর ফলে রোগ-পোকার আক্রমণ ও ধান গাছ হেলে পড়ার সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পায়।

ধান জমিতে ও বস্তায় কি কি সার দেওয়া যায়?

মূল ধানের জমিতে নির্ঘন্ট মেনেই সার প্রয়োগ করা হয়, তবে সবজি চাষের জন্য প্রতি ৫০ কেজি মাপের বস্তার ৪০ কেজি শুকনো মাটিতে মূল সার হিসেবে প্রায় ১০ কেজি খামারজাত সার, গোবর সার বা ভার্মিকম্পোস্ট এবং ৫০ গ্রাম এনপিকে (১০ঃ২৬ঃ২৬) ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। গাছের বৃদ্ধির সময় চাপান সার হিসেবে ২১-২৮ দিনের মাথায় প্রতি বস্তায় ২০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ৪২-৪৫ দিনের মধ্যে আরও ২০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১৫-২০ গ্রাম পটাশ সার গাছের গোড়া থেকে কিছুটা দূরে প্রয়োগ করতে হয়। সার মেশানোর আগে বস্তার উপরিভাগের মাটি খুরপি দিয়ে আলগা করে নিতে হয় এবং সার প্রয়োগের পর তা ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

এমন চাষে জল সেচ কেমন হবে?

ধানের জমিতে বর্ষাকালে সাধারণত আলাদা করে সেচের প্রয়োজন হয় না, তবে বর্ষা আগেভাগে শেষ হলে পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুযায়ী দু-একবার সেচ দেওয়া যেতে পারে। খরিফ মরশুমে বস্তায় আলাদা করে জল দেওয়ার দরকার হয় না, কারণ মাটির সূচিনালির (capillary tube) মাধ্যমে নিচ থেকে জল উপরে উঠে আসে অনায়াসে। তাছাড়া, পরের দিকে গাছের শেকড় বস্তা ভেদ করে মাটির নিচে প্রবেশ করলে সেখান থেকেই গাছ প্রয়োজনীয় জল ও পুষ্টি সংগ্রহ করে। তবে অতিরিক্ত বৃষ্টির সময় জল জমে যাওয়া রোধ করতে প্রতি বস্তায় আগে থেকে তৈরি -করা ছিদ্রগুলোকে মাঝে মধ্যে দেখে নেওয়া দরকার - যাতে ছিদ্রপথ ঠিকঠাক উন্মুক্ত থাকে।

লতার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ ও ডগা ছাঁটার কাজ (training and prunning) কিভাবে করবেন?

লতানে সবজির সঠিকভাবে মাচায় ওঠা ও বহুস্তরবিশিষ্ট ফসল ব্যবস্থায় সব ফসলে পর্যাপ্ত আলো প্রবেশ নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত অন্তর্বর্তী পরিচর্যা করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে লতাগুলোকে সঠিকভাবে মাচার দিকে পরিচালিত করা এবং প্রয়োজনে ছেঁটে ফেলে গাছের গঠন ঠিক রাখা জরুরি। প্রধান ও পার্শ্বীয় লতার আগা সময়ে সময়ে ছেঁটে দিলে বিভিন্ন শাখায় ফুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, ফলে ফলনও বাড়ে। এছাড়া, ছাঁটাই করা কচি লতাগুলোকে বাজারে পুষ্টিকর ও সুস্বাদু ডগা হিসেবে ভালো দামে বিক্রি করা যায়।

চাহিদা অনুযায়ী ফসল তুলবেন কখন?

লতানে ফসলের ফল সাধারণত কচি অর্থাৎ খাওয়ার উপযোগী অবস্থায় (ফসল ও জাতভেদে বপনের ৩৫-৫৫ দিনের মধ্যে) সংগ্রহ করা উচিত। সময়মতো সংগ্রহ না করলে ফল বুড়ো ও শক্ত হয়ে যায়, ফলে বাজারে চাহিদা ও দাম দুটোই কমে যায়। শুধুমাত্র বীজ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দেশী জাতের ক্ষেত্রে কয়েকটি ফল মাচায় রেখে সম্পূর্ণ পরিপক্ক হতে দেওয়া যেতে পারে। যেহেতু এই জাতীয় সবজিতে একসঙ্গে ফুল ও ফল হয় না, তাই ৪ - ৫ দিন অন্তর অন্তর ফল সংগ্রহ করাই ভাল; এতে ফলন ও গুণমান বজায় থাকে এবং বাজারের চাহিদাও নিয়মিত পূরণ করা যায়। অপরদিকে, নিচে থাকা ধান পুরোপুরি পেকে গেলে নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে কাস্তে বা ছোট রিপার যন্ত্রের সাহায্যে কেটে নিতে হবে।

আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি

খরিফ ধানের সাথে বস্তা-মাচা পদ্ধতিতে লতানে সবজির চাষ একক ধান চাষের তুলনায় অবশ্যই বেশি লাভজনক। এধরনের চাষে ব্যবহৃত উপকরণের বেশিরভাগটাই কৃষকের বাড়িতে পাওয়া যায়, কিনতে হলেও সেসব সহজপ্রাপ্য ও সস্তার। আবার সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করলে মাচা ৩ - ৪ বছর পর্যন্ত ব্যবহার করা যায় অনায়াসে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, এক হেক্টর জমি থেকে ধানের পাশাপাশি এই পদ্ধতিতে অতিরিক্ত প্রায় ১.৫ লক্ষ টাকা আয় সম্ভব। পাশাপাশি নিয়মিত পরিচর্যায় লতা নিয়ন্ত্রণ ও ছেঁটে ফেলা এবং অনেকবার ফল সংগ্রহের কাজে যেমন সারা মরশুমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ে, তেমনই কৃষক পরিবারের মা-বোনেদের সক্রিয় অংশগ্রহণে পারিপার্শ্বিক কৃষি সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

পশ্চিমবঙ্গে লঙ্কাচাষ বৃদ্ধির সম্ভাবনা

ঋষিকৃষ্ণ দে
অবসর প্রাপ্ত যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা

লঙ্কা একটি প্রধান অর্থকরী ফসল। দৈনন্দিন খাদ্যাভাসে লঙ্কা একটি অবিচ্ছেদ্য উপকরণ। স্বাদ ও পুষ্টি বৃদ্ধিতে লঙ্কার কোন জুড়ি নেই । কাঁচা লঙ্কা ও ক্যাপসিকাম সবজি হিসাবে এবং শুকনো লঙ্কা মশলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া, স্যালাড, আচার, চাটনি ইত্যাদিতে ও লঙ্কা, বেলপেপার ও ক্যাপসিকাম ব্যবহার হয়। আর্য়ুবৈদিক ঔষধ প্রস্তুতিতেও নানান ধরণের লঙ্কা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। লঙ্কা সুস্বাদু, বিরেচক ও ক্ষুধাবর্ধক। এতে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' ও ভিটামিন 'সি'। প্রতি ১০০ গ্রাম কাঁচালঙ্কায় আছে ৮৫.৭গ্রাম জল, ২.০১ গ্রাম প্রোটিন, ০.৬ গ্রাম ফ্যাট বা চর্বি, ৩.০গ্রাম শর্করা , ৬.৮গ্রাম তন্তু, ২৯ক্যালোরি শক্তি, ০.৩৯ মিলিগ্রাম রাইবোফ্লাবিন ও নানাধরণের খনিজ পদার্থ। কাঁচালঙ্কার 'রুটিন' নামক সবুজ রঞ্জক ঔষধি গুন অপরিসীম ।

পশ্চিমবঙ্গেঁ প্রায় সাড়ে তিন হাজার হেক্টর জমিতে লঙ্কা চাষ করা হয়ে থাকে, যাথেকে ১০০০-১১০০ মেট্রিক টন কাঁচালঙ্কা উৎপাদিত হয়। প্রায় খুব অল্পপরিমান লঙ্কা শুকনো হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এ রাজ্যে ব্যবহৃত শুকনো লঙ্কারভাগই আসে অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র থেকে। চাহিদার তুলনায় লুকানো লঙ্কার মোট উৎপাদন অতি সামান্য হওয়ায় এ রাজ্যে লুকানো লঙ্কা চাষ প্রচুর সম্ভবনা রয়েছে। এ ছাড়া ক্যাপসিকাম, বেলপেপার সহ অন্যান্য লঙ্কার চাহিদা ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উপযুক্ত জলবায়ু, মাটি ও বৃষ্টিপাত তথা জলসেচ এর ব্যবস্থা থাকায় প্রায় প্রতিটি জেলাতেই কমবেশী লঙ্কাচাষ করা যায়। যদিও এখন, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্বমেদিনীপুর ও কুচবিহারে জেলার মধ্যেই মূলতঃ লঙ্কা চাষ হয়ে থাকে।

উন্নত জাত ঃ

সূর্যমুখীঃ- ৫০-৬০ সেমি লম্বা খাড়া গাছ, গোড়া থেকেই ডালপালা ছাড়ে ফল উর্দ্ধমুখী, কাঁচা অবস্থায় যাই বা কালচে, পাকলে উজ্জ্বল লাল, তীব্রলাল। কাঁচালঙ্কায় ফলন একর প্রতি ৩০-৪০ কুইন্টাল এবং লুকানো লঙ্কার ফলন একর প্রতি ৫-৬ কুইন্টাল। সমতল ছাড়াও পাহাড়ী এলাকায় ও উচ্চ উপত্যকায় এই জাতের লঙ্কা চাষ করা হয়।

এল.পি-৪৬ এ ঃ- বেঁটে ও ঝাঁকড়া গাছ, হালকা সবুজ পাতা, ৮-৯সেমি লঙ্কা ফল সরু ও কোঁচকানো, হালকা সবুজ, পাকলে লাল, ভাইরাস রোজ প্রবল, কাঁচা লঙ্কায় - ফলন একর প্রতি ৩০-৩৬ কুইন্টাল।

পুসা জ্বালা ঃ- এন. পি. - ৪৬এ ও পুরীরেড জাতের সংমিশ্রনে উদ্ভুত জাতটির গাছ বেঁটে ও ঝাঁকড়া, হালকা সবুজ, চওড়া পাতা ফল ৯-১০ সেমি লম্বা , সরু হালকা সবুজ , পাকলে হাল্কা লাল। শুকনো ফল কুচকানো খুবই ভঙ্গুর হয়। শুকনো লঙ্কা হিসাবে চাষের উপযোগী নয়। কাঁচালঙ্কার ফলন একর প্রতি ৩৫-৪০ কুইন্টাল। এই জাতের লঙ্কা প্রায় সারাবছর চাষ করা হয়। চোষীপোকা বা থ্রীপ্স মাকড় বা মাইট পোকা এবং জাবপোকা বা আদিত্য এর আক্রমণ সহনশীল জাত এটি ।

পন্থ সি-১ ঃ- এন.পি ৪৬-১ ও কান্ধারি জাতদুটির সংমিশ্রনে উদ্ভুত জাতটি বেঁটে , ঝোপযুক্ত, থোকাথোকা উর্দ্ধমুখী ফল ৫-৬ সেমি লম্বা, তীব্রঝাল, হালকা সবুজ এবং পাকলে হালকা লাল।

জাতটি মোজাইক ও পাতা কোঁকড়ানো জাতীয় ভাইরাস রোগ সহনশীল। কাঁচা লঙ্কার জন্য উপযুক্ত জাত। ফলন একর প্রতি ৩০-৩২ কুইন্টাল।

বিধান চিলি -৪ ঃ- ধানীলঙ্কা হিসাবে পরিচিত। অত্যাধিক ঝাল ও সুগন্ধযুক্ত। কাঁচা এবং শুকনো - দুই ভাবেই চাষ করা যায়। একর প্রতি ৩০-৩৫ কুইন্টাল (কাঁচা) এবং ৫-৬ কুইন্টাল (শুকনো)। হলুদ মাকড় ও চোষীপোকার আক্রমন সহনশীল জাতটি বর্ষার পরে চাষ করলে ভালোফলন পাওয়া যায়।

পুসা সদাবাহার ঃ- পুসা জ্বালা ও আই. সি ৩১৩৩৯ জাত দুটির সংকরায়নের ফলে উদ্ভুত জাতটির খাড়া লম্বা গাছ, উদ্ধমুখী ফল ৬-৮সেমি লম্বা, থোকাতে একসাথে ৬-৭টি ফল ধরে। ভাইরাস রোগ সহনশীল জাত। শুকনোলঙ্কা হিসাবে চাষের উপযোগী নয় এই জাতটি।

অন্যান্য উন্নত জাতগুলির মধ্যে সিন্ধুর, এস্-১০০জি-৪,কে-২, বুলেট ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে বহু সংকর জাতের বীজ বাজারে পাওয়া যায়। এগুলির গুনমানও ফলনযোগায় ক্ষমতাও ভালো। তবে, বীজের দাম বহুগুনবেশী এবং প্রত্যেকবছর নতুন করে বীজ ক্রয় করার প্রয়োজন হয়। সংকর বা হাইব্রীড ঠিক থেকে চাষ করা ফসল থেকে বীজ রাখলে তা আর আগের মতো ফলন দেয় না।

শুকনো লঙ্কা হিসাবে চাষ করতে চাইলে তার উপযুক্ত জাতগুলি হলো কো-১, কিরন জিৎ, অঙ্গঁন, জি-৪, জি-৫, পান্থ সি-১, জওহর -২১৪ ইত্যাদি। সস প্রস্তুত করার জন্য উপযুক্ত জাতগুলি হলো মুসলাবাদি, পাঞ্জাবলাল, রেড ইয়েলো ইত্যাদি। খাদ্যে রং করার জন্য উপযোগী জাত হলো পবনুড়াব লাল। ক্যাপসিকাম এর উন্নত জাতগুলি হলো ক্যালিফোর্নিয়া ওরাণ্ডার, ইয়োলো ওরান্ডার, গ্রীন গোল্ড ইত্যাদি। হাইব্রীড বোম্বে, ইন্দ্র, স্বর্ণ, ভারত, আগরা ইত্যাদি। এছাড়া, হলুদ রং এর ক্যাপসিকাম অ্যাডমিরাল, লালরং এর ক্যাপসিকাম বোম্বে, ইন্সপিরেশন আর জেড পাসারেলা আর জেড, কালো রং এর ক্যাপসিকাম অ্যাকট্রোত্তো এক্স। হলুদ রং এর ক্যাপসিকাম ইয়েলো কিং উল্লেখ যোগ্য।

বেলপেপার এবং উন্নত জাতগুলি হলো ইয়েলো বেন, আরোনুও বেল, রেনবো বেল ইত্যাদি।

জলবায়ু ও মাটিঃ

উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া, ২০-৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা, বছরে ৬০০-১২০০ মিমি বৃষ্টিপাত, পর্যাপ্ত সূর্যালোক এবং জলনিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত দোঁয়াশ ও বেলে দোঁয়াশ মাটি লঙ্কা চাষের পক্ষ্যে উপযুক্ত। লঙ্কা গাছ খুব কমতাপমাত্রা ও দীর্ঘকালীন কুয়াশা সহ্য করতে পারে না । অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও অনিয়মিত তাপমাত্রায় পাতা, ফুলও ফল ঝরে যেতে পারে ও গাছ মরেযেতে পারে।

বীজের হার ও বীজ বপনঃ

সরাসরি জমিতে ছিটিয়ে বা নার্সারিতে চারা তৈরী করে ৩-৪ সপ্তাহ বয়সীচারা নির্দ্দিষ্ট দূরত্বে সারিতে রোপন করে লঙ্কা চাষ করা যায়। তবে চারা তৈরি করে নিয়ে মূল জমিতে সারিতে রোপন করাই ভালো। এর ফলে বীজ কম লাগে গাছের বৃদ্ধি সুসম হয়, রোগ -পোকা - আগাছা কম হয় , পরিচর্যায় সুবিধা হয় ও ফলন বেশী পাওয়া যায়। জাতের বৈশিষ্ট অনুযায়ী ৩০সেমি X ৩০ সেমি, ৩০সেমি X ৪৫ সেমি, ৪৫সেমি X ৪৫ সেমি দূরতে চারা রোপণ করা যেতে পারে। বোনার আগে বীজ অবশ্যই ছত্রাকনাশক দিয়ে শোধন করে নেওয়া উচিত। প্রতি একরে ৩০০-৫০০ গ্রাম বীজ লাগে।

বীজ তলার জন্য উর্বরমাটি ও জলনিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত উচুঁ জমি নির্বাচন করতে হবে এবং আগাছামুক্ত করে, ঝুর ঝুরে ও সমান করে মাটি তৈরী করতে হবে। মাটি তৈরি করার সময় একএকর জমির জন্য প্রয়োজনীয় বীজতলার মাটির সাথে ১ কুইন্টাল জৈবসার বা ৫০ কেজি ভার্মিকম্পোষ্ট, ১.৫ কেজি এনপিকে ১৫ঃ১৫ঃ১৫ সার এবং ১৫০-১৫০ গ্রাম কার্বোফুরান জাতীয় দানা কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

৩ফুট X ৩০ ফুট X ৬ ইঞ্চি মাপের এক একটি বীজতলা তৈরী করতে হবে। প্রাপ্ত জমির মাপ অনুযায়ী লম্বা কমবেশী করা যেতে পারে। বীজতলার উচ্চতা হবে মূলজমি থেকে ৬ ইঞ্চির। বীজ বোনার আগে বিজফেলার মাটি ০.০৪% কপার অক্সিক্লোরাইড জাতীয় ছত্রাকনাশক গোলা জল দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে। তাড়াতাড়ি অল্প গভীর নালা করে বীজ তলার উপর ১" X ১" দূরত্বে বীজ বুনতে হবে। বোনারপর হালকা করে ঝুরো মাটি দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হবে। প্রথম ৫ - ৭ দিন ভালো করে পরিস্কার করে নেওয়া খড় দিয়ে বীজতলার উপর আচ্ছাদন দিয়ে নিতে পারলে ভালো হয়। মাটির 'জো' অনুযায়ী মাঝে মাঝে ঝারির সাহায্যে অল্প অল্প জলসেচ দিতে হবে। ৩ - ৪ সপ্তাহে চারা তোলার ও রোপণ করার উপযোগী হয়ে যায়। চারা তোলার আগে মাটি ভিজিয়ে নিতে হবে এবং চারার শিকড় ছিঁড়ে না সেদিকে নজর রাখতে হবে। বিকালের দিকে চারা তোলা ও রোপন করা উচিত।

জমি তৈরীতে সার প্রয়োগ ঃ মূল জমিতে ৫ - ৬ বার চাষ দিয়ে আগাছামুক্ত করে জমির মাটি তৈরি করে নিতে হবে। প্রথম চাষের সময় একর প্রতি ৪ - ৫ টন জৈব সার অথবা ২ - ৩ টন ভার্মি কম্পোষ্ট এবং শেষ চারের আগে ১২ কেজি নাইট্রোজেন প্রয়োগ করতে হবে। রাসায়নিক সার চারা লাগানোর গর্ত বা 'খুপি' তে প্রয়োগ করলে ১০-২০ শতাংশ সার কম লাগবে। চাপান সার হিসাবে প্রতিবারে ১২ কেজি নাইট্রোজেন, ১২ কেজি ফসফেট ও ১২ কেজি পটাশ চারা লাগানোর ৩০ দিন ও ৫০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে এবং চারার গোড়ায় মাটি ধরিয়ে দিতে হবে। জমিতে 'জো' না থাকলে সার প্রয়োগের পর জলসেচ দিতে হবে।

মূল সার এর সাথে একর প্রতি ০.৭ কেজি সালফার, ১ কেজি জিঙ্ক সালফেট ও ০.৫ কেজি বোরাক্স প্রয়োগ করতে হবে। বোরাক্স বা সোহাগা প্রয়োগ করার আগে হালকা গরম জলে গুলে নিতে হবে।

বৃষ্টি নির্ভর চাষের জন্য মূল সার হিসাবে ১২ কেজি করে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ সার প্রয়োগ করার

পাশাপাশি গাছের পাতায় যথাক্রমে ৩০ দিন থেকে ৫০ দিন পর ১৯ঃ১৯ঃ১৯ জাতীয় সার ০.৫% হিসাবে স্প্রে করতে হবে।

জলসেচ ও পরিচর্যা ঃ

বীজ বোনার বা চারা লাগানোর সময় জমিতে যেন 'জো' থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং পরবর্তীকালে প্রয়োজন বুঝে ৪ - ৫ বার হালকা করে সেচ দিতে হবে। লঙ্কা চাষ খুব বেশী জলসেচের প্রয়োজন হয় না।

বীজ ও পরিচর্যা ঃ

বীজ বোনায় বা চারালাগানোর সময় জমিতে যেন 'জো' থাকে, সেদিকে লক্ষ্য করতে হবে এবং পরিবর্ত্তীকালে প্রয়োজন বুঝে ৪-৫ বার হালকা করে সেচ দিতে হবে।

ফল আসার সময় ও ফলধরার সময় জলসেচ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

চারা লাগানোর সময় প্রতি গাছে ৩ গ্রাম করে এবং প্রথম চাপানোর সময় ৫ গ্রাম করে কার্বোফুরান জাতীয় দানা কীট নাশাক চারার গোড়ায় প্রয়োগ করতে পারলে ভালো হয়। প্রতিবার চাপান সার ও চারার গোড়ায় মাটি ধরিয়ে দেওয়ার সময় গাছের গোড়ায় আগাছা তুলে ফেলতে হবে। বোনা পদ্ধতিতে চাষ করার ক্ষেত্রে বীজ বোনার ৩০ দিনের মাথায় নিড়ানি দিয়ে আগাছা ও অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলতে হবে। বোনা জমিতে বীজবোনায় ৩০ দিনপর এবং রোপন করা জমিতে চারা রোপনের ১৫ দিন পর গাছের ডগা ছেঁটে দিতে পারলে - ডালাপালা অধিক হবে এবং ফলন বেশী পাওয়া যাবে।

ক্যাপসিকাম জাতীয় ফসল চাষের সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ১.৫ ফুট এবং ফলআসার সময় গাছের গোড়ায় খুটি পুঁতে অবলম্বন করে দিতে হবে।

রোগ পোকা নিয়ন্ত্রন ঃ

বেশকয়েকটি পোকামাকড় ও রোগ জীবানু দ্বারা লঙ্কা, ক্যাপসিকাম ইত্যাদি গাছ আক্রান্ত হয়ে থাকে।

১) জাবপোকা - (Myzus persicae, Aphis gossypiz) জাবপোকা পাতা, ডগা, ফুল ও কচিফলের রস শোষণ করে এবং ভাইরাস রোগ ছড়ায়। আক্রান্ত অংশ ও বিবর্ণ হয়ে ধরে পড়ে। ডগা শুকিয়ে যায়। পোকা নিন্ত্রনের জন্য - ০.০৭৫% অ্যামিফেট, ০.০৩% ইমিডাক্লোপ্রিড বা ০.২% কার্বোসালফান জাতীয় কীটনাশক আঠা (sticker) সহ স্প্রে করতে হবে।

২) চোষী পোকা বা চিরুনী পোকা বা থ্রীপ্স (Scirthothrips dossalis) হালকা হলুদাভ সবুজ অতিক্ষুদ্র পোকা অপূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় গাছের পাতায় রস শোষণ করে, গাছ বিবর্ণ হয়ে শুকির যায়। পোকা নিয়ন্ত্রনের জন্য সুপারিশকৃত কীটনাশক ব্যবহার করা যাবে। চোষীপোকা ও ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

৩) সাদামাছি - (Bemisia tabaci) পূর্ণাঙ্গ পোকা ডানা যুক্ত এবং পাতার নিচের দিকে রস শোষণ করে গাছকে বিবর্ণন ও কমজোরী করে দেয়, ভাইরাস রোগ ছড়ায় পোকা নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা জাবপোকার মতো।

৪) মাকড় -(হলুদ-Poly phagotersionemus latus, লাল-Tetramychus uriticas) অতিক্ষুদ্র মাকড় জাতীয় কীটশত্রু পাতার নীচের দিকে থাকে, কোন কোন প্রজাতি জালিকা তৈরী করে, পাতা ও কচি ডগার রস শোষন করে খায়। আক্রান্ত পাতা কুঁকড়ে যায় ও বর্ণহীন হয়ে যায়। আক্রান্ত গাছ পুড়ে গেছে বলে মনে হয়।

৫) চারা ঢলে পড়া রোগ-(Pythiumsp., Phytophthura sp., Fusarium sp., Rhizoctonia sp.) ছত্রাকঘটিত রোগটির সংক্রমন অঙ্কুরিত চারা মাটির নীচে অথবা উপরে হঠাৎ ঢলে পড়ে (Damping off) এবং মাটি সংলগ্ন অংশে জলজমা হয়ে পচে যায়। বর্যাকালে এবং উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওযায় এই রোগের প্রার্দুভাব বাড়ে।

রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বীজশোধন, জমির মাটি শোধন, রোপণের আগে চারা শোধন করা অত্যন্ত জরুরী। বীজ শোধনের জন্য থাইরাম বা ক্যাপাটাল (০.০২%) জাতীয় ছত্রাকনাশক এবং জমির মাটি শোধনের জন্য জৈব স্ট্রাইকোডারমা ভিরিডি অথবা রাসায়নিক কপার অক্সিক্লোরাইড প্রয়োগ করা যেতে পারে। বীজতলার চারার ০.২৫% ম্যানকোজেব বা ০.২% ম্যানা - জেবমেটালাক্সিল জাতীয় ছত্রাকনাশক স্প্রে করা যেতে পারে। স্প্রে দ্রবনের সাথে আঠা জাতীয় পদার্থ (sticker) মেশাতে হবে।

(৬) পাতা কোঁকড়ানো রোগ - (Leafcurlvirus) ভাইরাস ঘটিত রোগটির আক্রমণে প্রথমে কচি পাতা ও ডগা এবং পরে নীচের দিকের পাতা কুঁকড়ে যায়, গাছ বেঁটে হয়ে যায়, ফুল ফল ধরে না বা বিকৃত আকার ও আকৃতির ফল ধরে জাবপোকা, সাদামাছি, চোষীপোকা ইত্যাদি কীটশত্রু এই রোগ ছড়ায়।

আক্রান্ত গাছ তুলে দূরে ফেলে দেওয়ার পাশাপাশি সুস্থ গাছে বাহক কীট শত্রু নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নিতে হবে।

ফসল তোলা ও ফলন ঃ

চারা রোপণের ৬০-৭০ দিন পর থেকে কাঁচা লঙ্কা তোলা শুরু করা যায় এবং আরও ১৫-২০ দিন পর থেকে পাকা লঙ্কা তোলা শুরু করা যায়। পরবর্তী ৩ মাস ধরে ৭ দিন অন্তর লঙ্কা তোলা যেতে পারে। পুষ্ট কাঁচা লঙ্কা এবং ভালোমতো পেকে লাল হয়ে যাওয়ার পর পাকা লঙ্কা তোলা উচিৎ।

বৃষ্টি সেচিত জমিতে প্রতি একরে ৩ - ৪ কুইন্টাল কাঁচা লঙ্কা এবং সেচসেবিত জমিতে ৬ - ৮ কুইন্টাল ফলন পাওয়া যায়। শুকনো লঙ্কার জন্য ফসল তোলার পর ভালো করে রোদে দিয়ে শুকিয়ে ঠাণ্ডা করে অন্ধকার ঘরে সংরক্ষণ করা উচিত। প্রখর সূর্যের তাপ, উচ্চ তাপমাত্রা এবং অক্সিজেন এর উপস্থিতিতে শুকনো লঙ্কার রং খারাপ হয়ে যেতে পারে। তাই, শুকনো করার যন্ত্রে (Drier) ৫৪° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় লঙ্কা শুকানো উচিত। ২-৩ দিন শুকানোর পর ঠাণ্ডা করে লঙ্কা সংরক্ষণ করতে হবে।

Xa জিনের জ্যাকেট মোড়া ধান - জীবাণু ধসার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানীদের সবুজ অভিযান

ড. শুভেন্দু দেব চ্যাটার্জ্জী
প্রাক্তন কৃষি অধিকর্তা ও পদাধিকার বলে সচিব
কৃষি বিভাগ

নীল দিগন্ত ছোঁয়া ধানক্ষেতের প্রশান্ত সবুজের অন্তরালে প্রায়ঃশই নিঃশব্দে ঘটে চলে এক অদৃশ্য দখলদারি। বড়জোর ২ মাইক্রোমিটার বাই (x) ০.৭ মাইক্রোমিটার বহরের অতিক্ষুদ্র অদৃশ্য এক হানাদার ধানের পাতার অদৃশ্য রন্ধ্র পথে গাছের ভেতরে ঢুকে পড়ে তুলকালাম কাণ্ড শুরু করে। সে না খায় পাতা, না কাটে শীষ, না চোষে রস। চুপিসারে কোষের *নিউক্লিয়ার মস্তিষ্কে* হানা দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে গাছের জিনগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে হ্যাক করে সেটিকে নিজের মর্জি মত চালনা করতে থাকে। গাছের খাদ্যভাণ্ডারে সঞ্চিত শর্করা, যা এতদিন বৃদ্ধি ও দানা-পুষ্টির কাজে নিয়োজিত ছিল, তাকে বিপথে পরিচালিত করে অনুপ্রবেশকারীর পুষ্টি জোগানোর কাজে যুক্ত করা হয়।

ফলাফল? তরতাজা সবুজের গভীরে ক্রমশ গাঢ় হতে থাকে ক্ষুধার ক্ষত। বেঁচে থেকেও গাছ ধীরে ধীরে ক্ষীণবল ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। অবশেষে অনাহারে নিঃশেষে শুকিয়ে মরে। এই সূক্ষ্ম অথচ ভয়ংকর কৌশলের নেপথ্যে লুকিয়ে আছে এক কুখ্যাত হানাদার, বিজ্ঞানের পরিভাষায় - জ্যান্থোমোনাস অরাইজি Xanthomonas oryzae (Xoo)।এটি একটি জীবাণু যা ধানের বিধ্বংসী রোগ **ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইটের** নায়ক।

এই ক্ষতিকর জীবাণুর প্রাদুর্ভাব ক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ দেশ নির্বিশেষে পৃথিবীর সমস্ত ধানক্ষেতে সমানভাবে পরিলক্ষিত হয়। আক্রমণের তীব্রতা ভেদে এই জীবাণুর কোপে ধানের ফলন ৩০ - ৮০% পর্যন্ত পড়ে যায় — যা সরাসরি কৃষকের জীবিকা ও সংশ্লিষ্ট দেশের খাদ্য নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে তোলে।

প্রকৃতপক্ষে ধান চাষের শুরু থেকেই চলে আসছে ধান ও এই জীবাণুর মধ্যে এক অবিরাম বেঁচে থাকার লড়াই। অনাদিকালের এক নিঃশব্দ কিন্তু তীব্র **আণবিক যুদ্ধ**। একপক্ষ শিখছে আক্রমণের নতুন কৌশল, অন্যপক্ষে গড়ে তুলছে প্রতিরোধের নতুন পথ। তবে আশার কথা, বন্য ও ঐতিহ্যবাহী ধানের জিনোমের গভীরে বিজ্ঞানীরা অবশেষে খুঁজে পেলেন এক শক্তিশালী প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা - একটি অন্তর্নির্মিত জৈব নিরাপত্তা বলয়, যা সম্মিলিতভাবে **Xa জিনসমূহ** নামে পরিচিত। এই বলয়ের প্রথম জিনটি পাওয়া যায় ১৯৬৭ সালে ঐতিহ্যবাহী জাপানি ধান কোজিওকু ও ইন্দোনেশিয়ান ধান জাভা-১৪ জাতের মধ্যে।

নীরব অনুপ্রবেশ থেকে জিন দখল : Xoo-র গুপ্ত অপারেশন

এই রোগের জীবাণুগুলি সারা বছরই ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকে ধানের নাড়া, গোড়া অথবা মাঠের আলে গজিয়ে ওঠা ঘাস জাতীয় আগাছায়। বৃষ্টির ফোঁটার ছিটায় ভর করে জীবাণুগুলো পৌঁছে যায় ধানের পাতায়। এরপর পাতার স্বাভাবিক ছিদ্র - **স্টোমাটা** দিয়ে ভিতরে ঢুকে সোজা চলে যায় **জাইলেম নালিতে**। জাইলেমের ভিতরে বসে জীবাণুগুলি একাধারে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে এবং সেই সাথে এক ধরনের আঠালো পদার্থ যার রাসায়নিক নাম **এক্সোপলি স্যাকারাইড** (EPS) নিঃসরণ করতে থাকে। জাইলেম নালি পথে মাটি থেকে শিকড়ের টানা জল গাছের পাতায় পৌঁছোয়। বাড়ির ড্রেনে ময়লা জমলে যেমন জল চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, এই আঠালো পদার্থ দলা বেঁধে জাইলেম নালিকে রুদ্ধ করে, ফলে জল পরিবহন কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায়। ফলে গাছের ভেতরে সৃষ্টি হয় এক ধরনের **অভ্যন্তরীণ খরা**। আক্রান্ত অংশ ক্রমশ জলের অভাবে বাদামী হতে হতে শুকোতে (নেক্রোসিস) শুরু করে।

কিন্তু এখানেই শেষ নয় - এটি কেবল আক্রমণের প্রথম ধাপ।

এরপর জীবাণুটি বের করে তার সবচেয়ে সূক্ষ্ম কিন্তু মোক্ষম অস্ত্র — সুঁচাকৃতি সিক্রিয়েশন সিস্টেম। এই পদ্ধতির মাধ্যমে জীবাণু ধানের কোষে ইঞ্জেক্ট করে তারই শরীরে উৎপাদিত **তাল** (Transcription activator-Like Effectors) নামে একটি বিশেষ প্রোটিন। এই প্রোটিনটি যেন এক দক্ষ হ্যাকার। সরাসরি কোষের নিউক্লিয়াসে পৌঁছে গিয়ে জিনের পূর্ব নির্ধারিত কার্যক্রমের পছন্দসই পুনর্বিন্যাস করে। এই পুনর্বিন্যাসের প্রধান লক্ষ্য ধানের **সুইট** (SWEET) জিনসমূহের কার্যক্রম পরিমিত করা। সুইট জিনের স্বাভাবিক কাজ হল ধানের পাতায় তৈরি শর্করা বা চিনি চাহিদামত শরীরের অন্যান্য অংশে পরিবহন করা। **"তাল"** প্রোটিনের কোপে সুইট জিনের এই স্বাভাবিক কার্যপ্রবাহ সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হয়ে যায়। জিনগুলো তখন পাতায় তৈরি শর্করা গাছের শরীরে পরিবহন না করে কোষের বাইরের অজীব অংশ যেমন কোষ প্রাচীর, আন্তঃকোষীয় অংশ এবং জাইলেমে টেনে নিয়ে আসতে শুরু করে। আর এখানে বাসা বাঁধা জীবাণুগুলো তা খেয়ে হৃষ্ট-পুষ্ট হয়ে বংশ বৃদ্ধি করতে থাকে। অর্থাৎ, গাছটি এখন আর শুধু আক্রান্ত নয়, বরং নিজে অনাহারে থেকে নিজের খাদ্য নিজেই শত্রুকে জোগাতে থাকে। যার অবশ্যম্ভাবী ফল অনাহারে, অপুষ্টিতে ক্ষীণকায় হতে হতে শুকিয়ে নিঃশেষ হওয়া।

প্রকৃতির গোপন অস্ত্রাগার ঃ ধানের জিনে লুকানো প্রতিরোধ শক্তি

প্রাণীদের মতো উদ্ভিদের শরীরে চলমান প্রতিরক্ষা কোষ নেই। তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে জিন নির্ভর। ধানের ক্ষেত্রে, -এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার শক্তিসম্পন্ন এক গুচ্ছ জিন খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। এখন পর্যন্ত জ্ঞাপিত সংখ্যা ৪৪টি। আবিষ্কৃত হওয়ার পর পরই এই জিনগুলোকে ক্রমানুসারে সংখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন এক্স এ১, এক্স এ২ .... এক্স এ৪৪। বিজ্ঞানী মহলে এরা সমষ্টিগতভাবে **Xa জিন** নামে পরিচিত। এদের মধ্যে কিছু প্রভাবশালী (Xa) এবং কিছু আবৃত (xa)। প্রভাবশালীর সংখ্যা ২৮, আবৃতের সংখ্যা ১৬। জ্ঞাপিত জিনের সংখ্যা ৪৪ হলেও এখন পর্যন্ত কেবল মাত্র যে ১৫টি জিন সফলভাবে ক্লোনিং এবং চরিত্রায়ন করা গেছে তারা হল Xa২১, Xa১, Xa৩/Xa২৬, Xa৪, xa৫, xa১৩, Xa১০, Xa২৩, Xa২৭, xa৪১, Xa১৪, Xa৪৫, Xa৪৭, xa২৫ এবং Xa৮। কাজের ধরণ অনুযায়ী এই ১৫টি জিনকে মোট তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীভুক্ত জিনের কাজ হল কোষের বাইরের অথবা ভিতরের পিঠে Xoo জীবানুর ছোঁয়া লাগলে যে তরঙ্গের , সৃষ্টি হয় তা ধরে জীবানুর অনুপ্রবেশ শনাক্ত করে আক্রান্ত কোষকে আসন্ন বিপদের সংকেত পাঠানো। সেই সঙ্গে প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তুলে ক্ষতির বহর নিয়ন্ত্রনে রাখা। এদেরকে **রাডার জিন** বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত জিনের কাজ হল মূলত সংক্রমিত স্থানের চারপাশের কোষগুলোকে দ্রুত মেরে ফেলা। যাতে জীবন্ত কলার অভাবে জীবানুর বংশবিস্তার রুদ্ধ হয়ে যায়। এদেরকে কেউ বলেন **কার্যনির্বাহী জিন,** কেউবা **সংহারকারি জিন**। Xa জিনের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত তিনগুলোর কর্মকান্ড অনেকটা অ্যান্টি ভাইরাস্ ধাঁচের। তাই এদেরকে সঙ্গত ভাবেই **হ্যাক-নাশক জিন** বলা যেতে পারে। এরা জীবাণুর সুইট জিন হ্যাকিঙের ফন্দি নস্যাৎ করে উদ্ভিদে ওই জিনের পূর্ব নির্দ্ধারিত ও স্বাভাবিক কার্যপ্রবাহ অক্ষুন্ন রেখে অনুপ্রবেশকারী জীবানুকে ভাতে মারে।

ধানের ব্যাকটেরিয়া ধসার বিরুদ্ধে কার্যকরী ও শক্তিশালী প্রতিরক্ষা গড়ে তুলতে হলে এই তিন শ্রেণীভুক্ত জিনের প্রতিভুদের একত্রিত হয়ে একযোগে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। অর্থাৎ প্রয়োজন ত্রিস্তরীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা - যা আক্রমণ শনাক্ত করে, দ্রুত প্রথমিক পাল্টা আঘাতে বীজাণুর বিস্তার রোধ করে সংক্রমণ প্রতিহত / প্রশমিত করে, এবং পরিশেষে হানাদার জীবাণুকে অনাহারে ফেলে শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হতে বাধ্য করে।

প্রথম প্রহরী ঃ বিপদের আভাস পেলেই সতর্ক সংকেত

এই ৪৪টি জিনের মধ্যে মূলত ৫টি (Xa21, Xa3/ Xa26, Xa4, Xa1, Xa14) জিনের কাজ হল কোষের বাইরের কিংবা ভেতরের পৃষ্ঠে বসে রাডারের মত স্রেফ পাহারাদারি করা। অনেকটা বাড়ির দরজায় বসানো নিরাপত্তা অ্যালার্মের মতো। Xoo ধানের কোষের সংস্পর্শে আসা মাত্র এরা একটি বিশেষ ধরণের প্রোটিন বা সংকেত (Pathogen- Associated Molecular Patterns / Effectors) নির্গত করে। এই রাডার জিনগুলোতে কোষের বাইরের দিকে প্লাজমা মেমব্রেনে তৈরি থাকা রিসেপ্টর প্রোটিনগুলো (receptor-like kinases) জীবাণুর এই সংকেতকে চিনে ফেলে। জীবানু নিঃসৃত এই প্রোটিনটি যখন রাডার জিনের রিসেপ্টরের সাথে যুক্ত হয়, তখন জিনের ভেতরের অংশটি (kinase domain) সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তাদের প্রোটিনের লেজে ফসফেট যুক্ত হয়ে যায় যাকে বিজ্ঞানীরা ফসফোরাইলেশন বলে থাকেন। সাথে সাথে জিনটি কোষের অন্দরে এক গুচ্ছ সংকেত পাঠাতে থাকে। অনেকটা রাডার থেকে কন্ট্রোল রুমে ম্যাসেজ পাঠানোর মত। এই ফসফোরাইলেশন সংকেতগুলো পৌঁছনো মাত্র গাছ দ্রুত কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে শুরু করে-

১) কোষ প্রাচীরে ক্যালোজ/ লিগনিন জমা করে তাকে শক্ত করে তুলতে থাকে যাতে জীবাণু সহজে ভেতরে ঢুকতে না পারে।

২) কোষের ভেতর দ্রুত হাইড্রোজেন পারক্সাইড বা এই জাতীয় ক্ষতিকারক রাসায়নিক, রিঅ্যাকটিভ অক্সিজেন স্পিসিস (ROS) তৈরি করে যা জীবাণুর কোষপ্রাচীর ভেঙ্গে দিতে সক্ষম।

৩) কোষের সাইটোপ্লাজমে ক্যালসিয়াম আয়নের ঘনত্ব বাড়িয়ে তরঙ্গের সৃষ্টি করে আক্রান্ত কোষের আশে পাশের অনাক্রান্ত কোষগুলোকে আগে ভাগেই যুদ্ধের জন্য সতর্ক হওয়ার বার্তা পাঠায়।

৪) অন্যান্য প্রতিরক্ষা জিনগুলোকে জাগিয়ে তোলে।

জিনগুলো এইভাবেই এক ধরনের **প্রারম্ভিক সতর্কীকরণ রাডার** হিসেবে কাজ করে। যা একদিকে যেমন দূর থেকে আসন্ন বিপদকে শনাক্ত করে, অন্যদিকে দ্রুত প্রতিরোধ গড়ে তুলে ব্যাকটেরিয়ার বিস্তারকে থামিয়ে দিয়ে বড় ক্ষতি হওয়ার আগেই জীবাণুর উপদ্রব নিয়ন্ত্রণে আনে। এই গোটা প্রক্রিয়াকে বলা হয় **PAMP-Triggered Immunity (PTI)**।

ঘুমন্ত যোদ্ধার জাগরণঃ এক্সিকিউটর জিনের মরণফাঁদ

Xoo ধান গাছের প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর (PTI) এড়িয়ে জাইলেমে বসত গড়ার সাথে সাথেই যখন জীবাণু নিজের শরীরে সংশ্লেষিত প্রোটিন **TAL effector** ধানের কোষে ঢুকে যেতে চায়, তখন উদ্ভিদের প্রয়োজন পড়ে প্রতি আক্রমণ গড়ে তোলার। ৪৪/৪৫টি জিনের মধ্যে যে চারটি জিন দ্বিতীয় পর্যায় এই প্রতিরক্ষার জন্য পারদর্শী বলে শনাক্ত হয়েছে তারা হল -Xa10, Xa47, Xa23, Xa27। সমষ্টিগতভাবে এদের নাম executor বা কার্যনির্বাহী জিন। আরও সঠিকভাবে বলা চলে আত্মঘাতী বাহিনী বা সুইসাইডাল স্কোয়াড। এর মধ্যে Xa 23 জিনটি সবচেয়ে শক্তিশালী। কারণ এই জিনটি জীবাণুর প্রায় সব ধরনের প্রজাতির বিরুদ্ধে কাজ করে। এদের কার্যপ্রণালী সত্যিই চমকপ্রদ।

Xoo যখন ধানের কোষে TAL effector প্রোটিন ঢুকিয়ে কোষের নিউক্লিয়াসের পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী হ্যাক করে সুইট জিনকে বিপথে চালিত করার ফন্দি আঁটে তখন এই অনুবিষ্ট প্রোটিনগুলো অজান্তেই এই এক্সিকিউটর জিনগুলোকে সক্রিয় করে ফেলে। কেননা এক্সিকিউটর জিনের সামনে একটি বিশেষ ডিএনএ অংশ থাকে যাকে EBE (Effector Binding Element) বলে। জীবাণুর ওই TAL প্রোটিন ভুলবশত এই EBE-তে যুক্ত হয়ে ঘুমন্ত এক্সিকিউটর জিনকে জাগ্রত বা অন করে দেয়। ফলে তৈরি হয় এক ধরণের বিষাক্ত প্রোটিন যার শক্তিশালী প্রতিক্রিয়ায় **(Hypersensitive Response (HR))** সংক্রমিত স্থানের চারপাশের

কোষগুলোর দ্রুত, সুনিয়ন্ত্রিত মৃত্যু (**programmed cell death**) হয় যেহেতু জীবাণু বেঁচে থাকা ও বংশবিস্তারের জন্য জীবিত কোষের ওপর নির্ভর করে, আক্রান্ত স্থানের চারপাশের কোষ মারা যাওয়ার সাথে সাথে জীবাণুও সেখানে আটকে পড়ে মারা যায়। গাছের অন্য অংশে ছড়াতে পারে না। এই অত্যন্ত নির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বলা হয় **Effector-Triggered Immunity (ETI)**।

হ্যাকিং ব্যর্থ ঃ খাদ্য না পেয়ে ঝিমিয়ে পড়া জীবাণু

কতিপয় জীবাণু কোনমতে আত্মঘাতী জিনের প্রকোপ এড়াতে পারলেও তৃতীয় স্তরের ওঁত পেতে বসে থাকা পুষ্টি-বঞ্চনাকারী জিনের ফাঁদ কোন মতেই এড়াতে পারে না। এই মরণ ফাঁদে আটকে পড়তেই ধেয়ে আসে জীবাণুর শেষের সে দিন। ধানের জিনোমে এতাবৎ মোট চারটি পুষ্টি-বঞ্চানাকারী জিনের সন্ধান পাওয়া গেছে। জ্ঞাত চারটি জিনই আবৃত (recessive) জিন -- xa13, xa25, xa41, xa5। এই জিনগুলো অত্যন্ত কৌশলী, এবং তাদের কার্যপদ্ধতি সূক্ষ্ম ও নিখুঁত। এরা সরাসরি জীবাণুকে শনাক্ত বা ধ্বংস করে না বটে তবে কেড়ে নেয় জীবাণুর বেঁচে থাকার মূল রসদ - **খাদ্য**।

সুইট জিনের গাছের পাতায় তৈরি শর্করাকে চাহিদামত গাছের শরীরের বিভিন্ন অংশে পরিবহনের স্বাভাবিক কর্মসূচী সম্পূর্ণ ভাবে হ্যাক করে সুইট জিনকে ওই শর্করা কোষের বাইরে পরিবহন করতে বাধ্য করতে পারার ওপরই জীবাণু সংক্রমণের সাফল্য নির্ভর করে। জীবাণুর পাঠানো অস্ত্র **তাল এফেকটর** প্রোটিনগুলো ধানের কোষের ডি এন এর নির্দিষ্ট জায়গায় (প্রমোটার রিজিয়ন) জুড়ে গেলে সুইট জিনের সুইচ আপনা আপনি অন হয়ে যায় এবং পরিবহন রুট পাল্টে শর্করা কোষের বাইরে আসতে থাকে। পুষ্টি-বঞ্চনাকারী এই জিনগুলো ধানের ডি এন এর এই প্রমোটার রিজিয়নে একটা ছোট **পরিবর্তন** (মিউটেশন) ঘটায় যার ফলে **তাল এফেকটর** প্রোটিনগুলো আর সেখানে জুড়ে যেতে পারে না। ফলে -

সুইট জিনের পরিবহন পথ বদলায় না

শর্করা বাইরে বেরিয়ে আসে না

জীবাণু চরম খাদ্যাভাবে পড়ে

অবশেষে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিতে টান পড়ায় জীবাণু ঝিমিয়ে পড়তে পড়তে নিঃশেষ হয়ে যায়।

ত্রিস্তরীয় ঢাল ঃ শনাক্ত-প্রতি আক্রমণ-নিশ্চিহ্ন

সবগুলো স্তর একসাথে মিললে তবেই গড়ে ওঠে এক অত্যন্ত সুশৃঙ্খল সমন্বিত জৈবিক প্রতিরক্ষা ঢাল।

Xa21, Xa4, Xa3, Xa26, Xa1, Xa14 — প্রাথমিক নজরদারি ও সংক্রমণ ধীর করা

Xa23, Xa27, Xa10, Xa7 — সংকেত ধরা পড়লেই পাল্টা আক্রমণ

xa13, xa25, xa41, xa5 — পুষ্টি সরবরাহ বন্ধ করে জীবাণুকে অনাহারে ফেলে মারা

বিজ্ঞান থেকে ফসল ঃ জিন পিরামিডিংয়ের বাস্তব সাফল্য

Xa জিনের আবিষ্কার ধান প্রজননে এক বিপ্লব এনেছে। **Marker - assisted pyramiding** পদ্ধতির মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা একাধিক প্রতিরোধী জিন একত্রে সংযোজন করে জনপ্রিয় ধানের গুণগত মানও ফলন অক্ষুণ্ণ রেখে জাতগুলোকে দীর্ঘস্থায়ী রোগ প্রতিরোধী জাতে রূপান্তরিত করেছেন। সাম্প্রতিক কালে এই কৌশলে উদ্ভাবিত যে উন্নত জাতগুলো স্থিতিশীল ফলন, রপ্তানিযোগ্য গুণমান এবং শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য আজ জনপ্রিয় তাদের কয়েকটির নাম নীচে দেওয়া রইল।

Improved Samba Mashuri (Xa21, xa13, xa5) — রোগপ্রবণ সাম্বা মাশুরির উন্নত রূপ

Pusa Basmati-1886 (xa13, Xa21) — সংবেদনশীল বাসমতী-৬ এর বিকল্প

DRR Dhan 53 (Xa21, xa13, xa5, Xa38) — উচ্চফলন শীল কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ জাতগুলোর বিকল্প প্রতিবিম্ব

Xa জিনের গল্প আমাদের যে গভীর সত্যের কথা মনে করিয়ে দেয় তাহলো উদ্ভিদের সবচেয়ে ভয়ংকর জীবাণুর বিরুদ্ধেও প্রকৃতি নিজেই উদ্ভিদের DNA-র ভেতরে শক্তিশালী সমাধানের বীজ লুকিয়ে রেখেছে। আজকের বিজ্ঞানীরা শুধু সেই ভাষা পড়তে শিখেছে, সেগুলোকে একত্র করে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে শিখেছে। ফলে ধান আজ আর Xoo আক্রমণের সামনে অসহায় ফসল নয় - বরং এক সজ্জিত যোদ্ধা, যার হাতে রয়েছে তার নিজস্ব অপ্রতিরোধ্য জৈবিক **প্রতিরক্ষা ঢাল**।

চুকাই বা রোজেলা সম্ভাবনাময় অর্থকরী ফসল

- ডঃ সমরেন্দ্র নাথ খাঁড়া
প্রাক্তন অধিকর্তা
উদ্যান পালন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ

চুকাই, চুকুর, মেস্তা, টক ফল, টক ট্যাঁড়স হলো এক ধরণের উপগুল্ম জাতীয় উদ্ভিদের ফল। এটি একটি টক স্বাদযুক্ত ফল ও ভেষজ গুণসম্পন্ন উদ্ভিদ। মেস্তা পাটের প্রায় সদৃশ কিন্তু ভিন্ন একটি পাট প্রজাতি উদ্ভিদ। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে ফলটি পরিচিত। যেমন - অম্ল, মধু, অম্বল মধু, ধামরাই, চুকুল, হইলফা, মেডশ, মেট্টস, মেস্টা, চুপুরি, হঁরোগুলো, চুকুরি, চুকোর, চুপড়, চুক্তি, চুই, খিইরুপ ইত্যাদি। চাকমা ভাষায় এটাকে আমিল্যে বলা হয়।

কেরালায় লালচাটনি, আসামে টেঙ্গামোরা, ইন্দোনেশিয়ায় রোজেলা, রোসেলা বা রোজেল, ইরানে চায়ে-তরশ, আরব দেশসমূহে কারকাদি, ক্যারিবিয় ও লাতিন আমেরিকায় সরেল, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বিসাপ নামে পরিচিতি।

ইংরেজি নাম রোজেলা, রোজেল ও সরেল। বৈজ্ঞানিক নাম - Hibiscus Sabdariffai

আদি নিবাসঃ

ক্রান্তীয় আফ্রিকা চুকাই গাছের আদি নিবাস বলে ধারণা করা হয়।

বিস্তৃতিঃ

পৃথিবীর অনেক দেশেই সবজি মেস্তা খাদ্য হিসাবে খুবই জনপ্রিয়। আফ্রিকা, কেনিয়া, ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া, মেক্সিকো, ভারত, চীন, ফিলিপাইন, আমেরিকাসহ পৃথিবীর অন্যান্য উষ্ণমণ্ডলীয় দেশে চুকুর ভাল জন্মায়। তবে মেক্সিকো, জামাইকা, চীন এবং সুদানে সবচেয়ে বেশি চুকুর উৎপাদন হয়। বর্তমানে এর বাণিজ্যিক গুরুত্বের জন্য এশিয়ার অনেক দেশ যেমন - থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা ও ইন্দোনেশিয়াতে চুকুরের চাষের এলাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পৃথিবীর অনেক দেশের মতো ভারতবর্ষে এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা, যেমন - বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, নদিয়া, পুরুলিয়া, উত্তর ২৪ পরগণাসহ বিভিন্ন জেলায় এই গাছের বাণিজ্যিক চাষ শুরু হয়েছে।

গাছের বর্ণনাঃ

গাছ এক ধরনের পুষ্পবাহী উদ্ভিদ, যা সাধারণত একবর্ষজীবী। এর উচ্চতা ৩ থেকে ৫ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। গাছের পাতাগুলি লম্বাটে, খাঁজকাটা এবং ৫-৭টি শিরাযুক্ত। ফলটি গাঢ় লাল রঙের এবং টক স্বাদযুক্ত। শাখা-প্রশাখা যুক্ত এর কাণ্ড তামাটে রঙের হয়। কাণ্ড এবং পাতায় কোনো কাঁটা থাকে না। পাতা গাঢ় সবুজ রঙের কিন্তু পরিণত অবস্থায় তামাটে লাল রং ধারণ করে এবং খণ্ডিত আঙ্গুল আকৃতির হয়। পাতার কিনারা ঢেউ খেলানো। পাতার বোঁটা ১০-১১ সেমি হয়। ফুলের ব্যাস ৫ - ৭ মিমি, পাঁপড়ি হলদে, গোড়ায় মেরুন দাগ থাকে। এর ফল ক্যাপসুল আকৃতির, ওপরের দিকে চোখা ও রোমমুক্ত এবং বৃতি পুরু ও মাংসালো। অপ্রকৃত ফল। ভক্ষণযোগ্য বৃতি খুবই পাতলা এবং পরিমাণে অল্প। ছোট ছোট হুলযুক্ত গর্ভাশয়টি বড় হয়। ভক্ষণযোগ্য অংশটি গর্ভাশয়কে ঢাকা দিয়ে রাখে। পরিপক্ক গর্ভাশয়ে অনেকগুলো বীজ থাকে। এটি বিদারী ফল অর্থাৎ এটা পাকলে ফেটে যায় এবং বীজ ছড়িয়ে যায়। বীজ গাঢ় বাদামী, রেমিফর্ম ও কিডনি আকারের হয়। চুকুরের ১০০০টি বীজের ওজন প্রায় ২০ গ্রাম হয়।

পুষ্টিগুণঃ

প্রতি ১০০ গ্রাম ফলে আছে প্রোটিন - ৯৬০ মিলি গ্রাম, পটাশিয়ামের পরিমাণ - ২০৮ মিলি গ্রাম, ক্যালসিয়ামের পরিমাণ - ২১৫ মিলিগ্রাম, এতে ভিটামিন সি, ভিটামিন-এ, প্রোটিন, ক্যারোটিন, ক্যালসিয়ামসহ বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান ও অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে।

এটি উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং স্নায়ুরোগের চিকিৎসায় উপকারী। চুকাই বীজে স্নেহ দ্রবণীয় এন্টি অক্সিডেন্ট আছে, বিশেষতঃ গামা-টোকোফেরল। এটি ত্বকের অসুখ রোধ করে।

ব্যবহারঃ

সবজি হিসেবে এর পাতা রান্না করে ও ফল হিসাবে খাওয়া হয়। চুকাই পাতা ও ফল রসুন, কাঁচামরিচ ও চিংড়ি মাছ বা অন্য মাছ সহযোগে ভাজি করে অথবা তরকারি রান্না করে খাওয়া হয়। ইতালি, আফ্রিকা, থাইল্যাণ্ডসহ বিভিন্ন দেশে চুকাই পাতা দিয়ে ভেষজ চা, হিবিসকাস টি নামে পান করা হয়। চা বা সরবত শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং হজমের সমস্যা দূর করতে পারে। বীজ থেকে ২০ শতাংশ খাবার তেল উৎপাদন হয়। চুকারের তেলে ১৫.৮ পালসিটিক অ্যাসিড, ৬.৮ স্টিয়ারিক অ্যাসিড, ৫১ অলিক অ্যাসিড ও ২৬.৮ লিনোলিক অ্যাসিড থাকে। চুকারের তেল পৃথিবীর অনেক দেশে সাবান তৈরিতে ব্যবহার করা হয় এবং খাবার তেলে মেশানো হয়। চুকুর গাছ জলেতে পচিয়ে আঁশ তৈরি করা যায়। যা থেকে রশি দিয়ে গৃহে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করা হয়। এক সময় চুকাই গাছ কবিরাজী ওযুধ হিসাবে মূত্রবর্ধক, মৃদু কোষ্ঠ-নরমকারী,

হৃদরোগ, ক্যান্সার এবং স্নায়ুরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হতো।

চাষ পদ্ধতি ঃ

জমি ঃ উঁচু এবং মধ্যম উঁচু দোআঁশ এবং বেলে দোআঁশ মাটির জমিতে রোজেলা বা চুকাই চাষ করার জন্য আদর্শ। তাছাড়া পাহাড়ি এলাকায়, বাড়ির উঠোনে ও আশেপাশের জমিতে, অনুর্বর কিন্তু আবাদযোগ্য জমিতে চুকুর চাষাবাদ ভালো হয়। সমতল ভুমির চেয়ে পাহাড়ি এলাকায় চুকাই গাছ বেশি জন্মায়। জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। খরা সহনশীল হওয়ায় শুষ্ক অঞ্চলের প্রান্তিক জমিতে আবাদ করা যায়। নেমাটোড, স্পাইরাল বোরার ও শিকড়ে গিঁট রোগ প্রতিরোধী।

মাটি ঃ চুকাই গাছের জন্য দোআঁশ এবং বেলে দোআঁশ মাটি আদর্শ। এটি বেলে দোআঁশ মাটিতে ভাল ফলন দেয়। মাটির pH ৬ - ৭ এর মধ্যে থাকা উচিত।

জলবায়ু ঃ সাধারণত উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে এই গাছ ভালোভাবে জন্মায়।

জমি তৈরি ঃ চুকাই চাষের জন্য আড়াআড়িভাবে ৩ থেকে ৪ বার চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। এর শিকড় মাটির বেশ গভীর থেকেও খাদ্যরস সংগ্রহ করে, তাই জমি গভীর করে চাষ দেওয়া দরকার। আগাছা বাছাই করে ফেলতে হবে।

চারা তৈরি ঃ সাধারণত চুকাই বা রোজেলার চারা বীজ থেকে তৈরি করা হয়।

বীজ বপন ঃ সরাসরি জমিতে বীজ বুনে চাষ করা হয়। তবে পাহাড়ের ঢালে বীজ বুনলে প্রতি গর্তে ৩ থেকে ৪টি করে বীজ বপন করতে হবে। বীজ থেকে চারা হওয়ার পর চারাতে ২ - ৩টি পাতা বের হলে প্রতি গর্তে ১ - ২টি চারা রেখে বাকি গুলো তুলে ফেলতে হবে।

বীজের হার ঃ ছিটিয়ে বপন পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রতি বিঘায় ১ কেজি ৬০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি ৮৫০ গ্রাম এবং সারিতে বপন পদ্ধতির ক্ষেত্রে ১ কেজি ৩০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি ৬০০ পরিমাণ বীজ প্রয়োজন হয়।

বীজ বোনার সময় ঃ বীজ বপনের আদর্শ সময় বৈশাখের প্রথম থেকে শ্রাবণের শেষ পর্যন্ত। জুম চাষ করার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ চৈত্র মাস থেকে বৈশাখ মাসে বীজ বোনা হয়। সবজি হিসাবে বৈশাখের প্রথম থেকে শ্রাবণের শেষ পর্যন্ত সময় বপন করা যায়।

দূরত্ব ঃ বীজ ২ থেকে ২.৫ ফুট দূরত্বে সারি করে বপন করতে হবে।

সার প্রয়োগ ঃ সাধারণতঃ চুকাইর চাষের জমিতে সার প্রয়োগ করতে হয় না। তবে ভালো ফলন ও গাছের বৃদ্ধির জন্য মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সাধারণভাবে প্রতি বিঘায় গোবর ১৫০ কেজি, ১৭.৫ কেজি ইউরিয়া, ৩.৫ কেজি টিএসপি, ৫.৫ কেজি এমও পি জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হয়। এছাড়া বীজ বোনার এক মাস পর প্রতি বিঘায় ১ কেজি থেকে ১কেজি ২০০ গ্রাম ইউরিয়া চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করলে ভালো ফলন হয়।

সেচ ঃ চুকাই বা রোজেলা গাছ একদম জল সহ্য করতে পারে না। লক্ষ্য রাখতে হবে বৃষ্টি বা সেচের জল চাষের জমিতে জমে যেন না থাকে। চুকাই চাষের জমিতে প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিতে হবে।

পুস্তক পরিচিতি

কামরূপ কামাখ্যা ও গৌহাটির তীর্থ দর্শন - শ্রীলা দত্তগুপ্তা, ড. বিভূতিভূষণ সরকার, আগরতলা, ত্রিপুরা

প্রকাশক ঃ দেবী বুক স্টল, ২১/১এ, পাটুয়াটোলা লেন, কোলকাতা - ৭০০ ০০৯

মূল্য - ৩৫০ টাকা, পৃষ্ঠা - ১৯৬ রঙ্গীন ছবি সহ

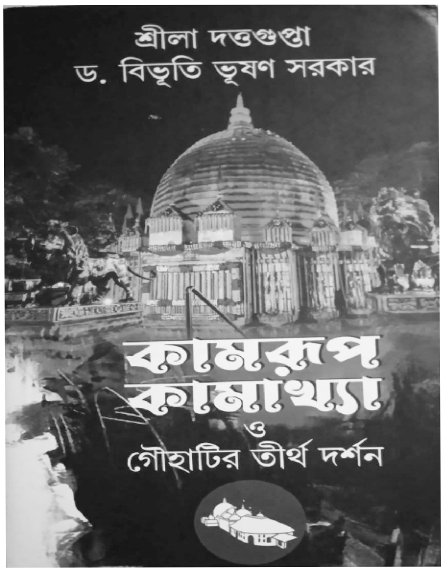

কামাখ্যা ধামে প্রধান উৎসব অম্বুবাচী মহা ধুমধামে পালিত হয় এবং দেশ-বিদেশ থেকে বহু দর্শনার্থী ও সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হয়।

বইটির মধ্য ধর্ম সংশ্লিষ্ট আলোচনার মধ্যে কৃষির সম্বন্ধযুক্ত তত্ত্ব এবং স্থানীয় কৃষি ব্যবস্থার ওপর আলোকপাত পরিলক্ষিত হয়।

কৃষি প্রধান ভারতবর্ষের হিন্দু, বৌদ্ধ কৃষকগণের বিশ্বাস অম্বুবাচীর সময় ধরিত্রী মাতার শরীর খারাপ থাকে এবং এই সময় মাটিতে আঘাতজনিত কাজকর্ম, হালচাষ থেকে বিরত থাকেন। অম্বুবাচীর পর বর্ষার জল ধারায় মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং খারিফ ও রবি মরশুমের ফসল চাষবাস করে অধিক লাভবান হয়।

কামাখ্যা পাহাড়ে মন্দির-দেবালয় দর্শনের সাথে কোটি লিঙ্গ শিব মন্দিরে সিঁড়ি পথে যাওয়ার সময় পাহাড়ের ঢালে কৃষিজ ও উদ্যানজাত ফসল বিশেষ করে ধান, কচু, লাউ, কুমড়ো, সুপারী ফসল এবং নরকাসুর দ্বারা নির্মিত পশ্চিম সিঁড়ি পথের ধারে নারিকেল, সুপারী, পেঁপে, কলা, আম, কাঁঠাল, সবেদা ইত্যাদির চাষবাসের উল্লেখ এবং দেবদেবীদের মন্দিরের আশেপাশে তাঁদের প্রিয় ফল, ফুল ইত্যাদির চাষ হতে দেখা যায়।

কামরূপ কামাখ্যা ও গৌহাটির তীর্থ দর্শন পুস্তকটির রঙ্গীন প্রচ্ছদ নান্দনিক। বইটি পড়ে তীর্থ দর্শনার্থী ও পর্যটকদের আধ্যাত্মিক, স্থানীয় ধর্মতত্ত্বীয় অনুষ্ঠান, প্রাকৃতিক পরিবেশ, কৃষ্টি ও কৃষি সম্পর্কে সুন্দর অভিজ্ঞতা অর্জিত হবে আশা করা যায়।

সুগন্ধি ‘রাধাতিলক’ ধানের নিবন্ধীকরণ, উৎপাদন ও বিপণন

ড. মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ[১], ড. অমিতাভ বিশ্বাস[১], ড. তাপস বিশ্বাস[১], ড. শিবাজী ব্যানার্জী[১], ড. সুতনু সরকার[১], ড. প্রণব দেবনাথ[১], ড. সঞ্জয় কুমার বরদলুই[১], ড. কিংশুক ঢালি[১], ড. ঝুমা দত্ত[১], ড. শঙ্খজিৎ রায়[১], সুচেতন চক্রবর্তী[২], কাব্যিয়াসেলভান ভি.[২], শ্রীপ্রিয়া দাস[২], মৈনাক সরকার[২], অয়ন বাগ[২], ইলোরা বাগ[২], সুদীপ্ত সরকার[২], সৌমী সাহা[২], সবুজ পতি[২], তরুণ সরকার[৩], গৌতম গাঙ্গুলী[৪], রহিদুল মণ্ডল[৪] ও শৈবাল রায়[৪]

[১]অধ্যাপক, [২]গবেষক, [৩]বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মোহনপুর, নদীয়া,
[৪]প্রকল্প সহায়ক, ‘বাংলার সুগন্ধি ধান প্রকল্প’।

নামকরণ ও ইতিহাস

‘রাধাতিলক’ বাংলার একটি প্রসিদ্ধ দেশি সুগন্ধি ধান। লোককথা অনুযায়ী, নামের শব্দবন্ধ থেকে এর চাষের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী মানুষদের একটি সম্পর্ক রয়েছে বলে অনুমান করা যায়। বৈষ্ণবদের আরাধ্য দেবতা ‘কৃষ্ণ’-এর প্রেম সহচরী ‘রাধা’ এবং তাদের অঙ্গশোভার পবিত্র চিহ্ন হিসাবে অঙ্কিত ‘তিলক’ শব্দদুটি একত্র করে সম্ভবত রাধাতিলক নামকরণ হয়েছে। প্রাচীন বইপত্র ও জেলা সমীক্ষাগুলিতে রাধাতিলক ধান চাষের প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় নি। তবে দেবল দেব (২০০৪) রচিত ‘Seeds of Tradition, Seeds of Future : Folk Rice Varieties of Eastern India’ বইতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ‘রাধাতিলক’ ধান চাষের কথা জানতে পারা যায়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, গুণমান ও ব্যবহার

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণীস্থিত ‘সি’ ব্লক খামারে ২০১১, ২০12 ও ২০13 সালের খরিফ মরশুমে নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উক্ত ধানের বৈশিষ্ট্য পঞ্জীকরণ ও নিশ্চিন্তকরণ করা হয়। রাধাতিলক গাছের মুখ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (সারণি ১ ও চিত্র ১) ও চালের গুণমান (সারণি ২) নিম্নে বর্ণিত হল। রাধাতিলক চাল সাধারণত পায়েস, ভোগ, খিচুড়ি প্রভৃতি রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয়।

‘রাধাতিলক’ ধান কৃষকের জাত হিসাবে নিবন্ধীকরণ

বর্তমানে বিশ্বে আধুনিক কৃষি

সারণি ১ঃ রাধাতিলক গাছের বৈশিষ্ট্য ও গুণমান

গাছের বৈশিষ্ট্য	মান
জীবনকাল	১৪৫-১৫০ দিন
গাছের উচ্চতা	১৩০-১৪০ সেমি
প্রতি গাছে শীষের সংখ্যা	৮-১২টি
শীষের দৈর্ঘ্য	২৩-২৫সেমি.
প্রতি শীষে ধানের সংখ্যা	১৩০-১৬০টি
ধানের বর্ণ	হলুদ বর্ণের ধানের উপর লালচে-বাদামি বর্ণের বিন্দু
১০০০টি ধানের ওজন	১১.৪ - ১১.৬ গ্রাম
ফলন	২.৬ - ৩.২ টন/হেক্টর

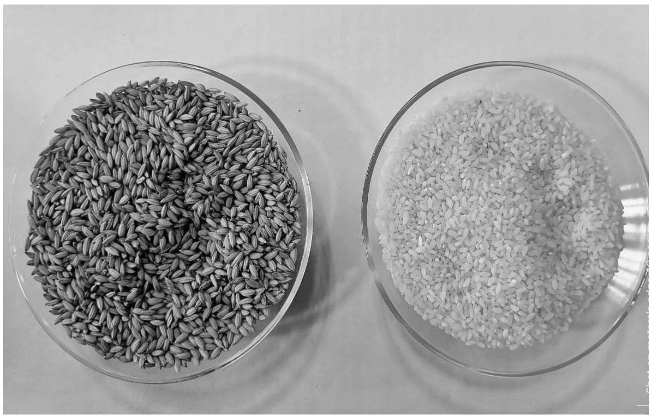

সারণি ২ঃ রাধাতিলক চালের গুণমান

চালের গুণমান	মান
চালের বর্ণ	সাদা
চালের আকৃতি	ছোট-মোটা চাল (দৈর্ঘ্য ৮.০-৪.১মি.মি., প্রস্থ ২.০-২.১ মি.মি.)
ধান থেকে প্রাপ্ত চাল	৬০ - ৬৩%
অ্যামাইলোজ	১৮ - ১৯%
প্রোটিন	৭.১ - ৭.৪%
রান্নার পরে চালের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি	১.৮ - ১.৯গুণ
সুগন্ধের মাত্রা	মাঝারি - তীব্র

ব্যবস্থায় ফসলের দেশি জাত বা ‘কৃষকের জাত’গুলির সুরক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য আমাদের দেশে Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Act নামক আইনটি ২০০১ সালে সংসদে পাশ হয়েছে। উক্ত আইনের অধীনে ‘রাধাতিলক’ জাতের নিবন্ধীকরণের জন্য বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার অধীনে ‘বাংলার সুগন্ধি ধান’ প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে ও গবেষণা অধিকর্তার সুপারিশক্রমে ২০১৩ সালে নদীয়া জেলার শান্তিপুর ব্লকের ‘কদমপুর কৃষি ফার্মার্স ক্লাব’ তথ্য ও নথিসহ আবেদনপত্র ‘উদ্ভিদজাত ও কৃষকের অধিকার রক্ষা সংস্থা’ (Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Authority), নতুন দিল্লীতে জমা দেওয়া হয়, যা উক্ত সংস্থায় নথিভূক্ত হয় (আর.ই.জি./২০১৪/৫, তারিখ ০৬.০১.২০১৪)। প্রাথমিক নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয় সংস্থার সুপারিশকৃত গবেষণাকেন্দ্রে উক্ত জাতের ‘বিশিষ্টতা, একরূপতা ও স্থায়িত্ব’ পরীক্ষা (DUS Test) করা হয়। পরীক্ষার ফলের উপর ভিত্তি করে ও জাতের সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে পরবর্তী ধাপে Plant Variety Journal of India-এ (বর্ষ ১৮, সংখ্যা ২, ফেব্রুয়ারি ২০২৪) ‘রাধাতিলক’ জাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ ও ব্যবহার সম্পর্কে তথ্য সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে ৩ মাস সময়কালে দাবি যাচাই করা হয়। সমস্ত ধাপ উত্তীর্ণ হবার পর ভারতর সরকারের অধীনস্থ Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Authority-র তরফে ‘কৃষকের জাত’ হিসাবে ‘রাধাতিলক’ ধান নিবন্ধী করণের শংসাপত্র (নম্বর আর.ই.জি./ ২০১৪ /৫, তারিখ ১২.০৬. ২০২৪) কদমপুর কৃষি ফার্মার্স ক্লাবকে প্রদান করা হয়(চিত্র ২)।

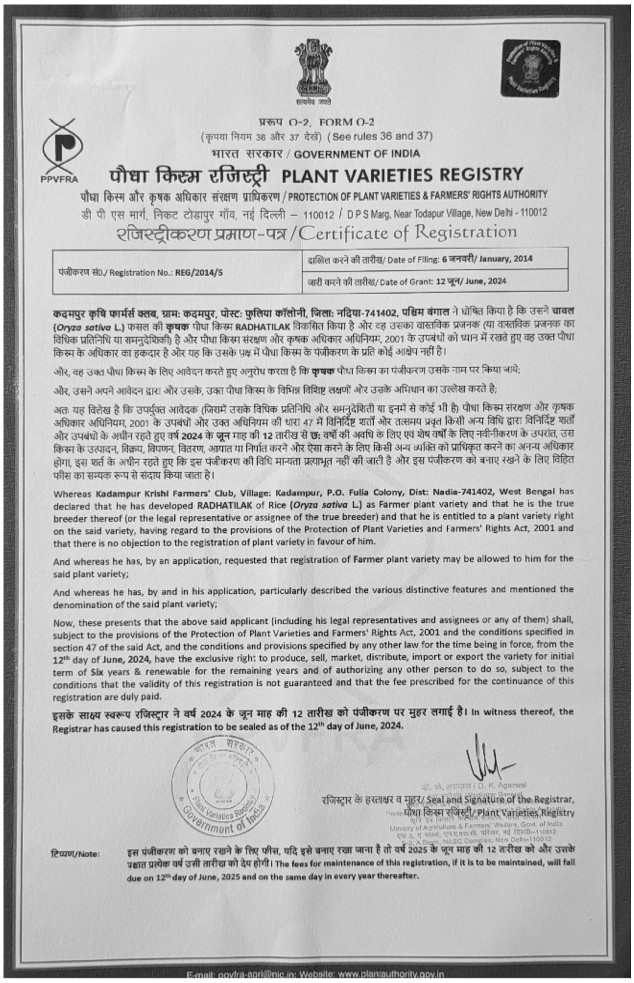

प्ररूप O-2, FORM O-2
(कृपया नियम 36 और 37 देखें) (See rules 36 and 37)
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पौधा किस्म रजिस्ट्री PLANT VARIETIES REGISTRY
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण / PROTECTION OF PLANT VARIETIES & FARMERS' RIGHTS AUTHORITY
डी पी एस मार्ग, निकट टोडापुर गाँव, नई दिल्ली – 110012 / D P S Marg, Near Todapur Village, New Delhi - 110012
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र / Certificate of Registration

पंजीकरण सं0./ Registration No.: REG/2014/5	दाखिल करने की तारीख/ Date of Filing: 6 जनवरी/ January, 2014
	जारी करने की तारीख/ Date of Grant: 12 जून/ June, 2024

कदमपुर कृषि फार्मर्स क्लब, ग्राम: कदमपुर, पोस्ट: फुलिया कॉलोनी, जिला: नदिया-741402, पश्चिम बंगाल ने घोषित किया है कि उसने चावल (*Oryza sativa* L.) फसल की कृषक पौधा किस्म RADHATILAK विकसित किया है और वह उसका वास्तविक प्रजनक (या वास्तविक प्रजनक का विधिक प्रतिनिधि या समनुदेशिती) है और पौधा किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए वह उक्त पौधा किस्म के अधिकार का हकदार है और यह कि उसके पक्ष में पौधा किस्म के पंजीकरण के प्रति कोई आक्षेप नहीं है।

और, वह उक्त पौधा किस्म के लिए आवेदन करते हुए अनुरोध करता है कि कृषक पौधा किस्म का पंजीकरण उसके नाम पर किया जाये;

और, उसने अपने आवेदन द्वारा और उसके, उक्त पौधा किस्म के विभिन्न विशिष्ट लक्षणों और उसके अभिधान का उल्लेख करते है;

अतः यह विलेख है कि उपर्युक्त आवेदक (जिसमें उसके विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिती या इनमें से कोई भी है) पौधा किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 के उपबंधों और उक्त अधिनियम की धारा 47 में विनिर्दिष्ट शर्तों और तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों और उपबंधो के अधीन रहते हुए वर्ष 2024 के जून माह की 12 तारीख से छः वर्षों की अवधि के लिए एवं शेष वर्षों के लिए नवीनीकरण के उपरांत, उस किस्म के उत्पादन, विक्रय, विपणन, वितरण, आयात या निर्यात करने और ऐसा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत करने का अनन्य अधिकार होगा, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि इस पंजीकरण की विधि मान्यता प्रत्याभूत नहीं की जाती है और इस पंजीकरण को बनाए रखने के लिए विहित फीस का सम्यक रूप से संदाय किया जाता है।

Whereas Kadampur Krishi Farmers' Club, Village: Kadampur, P.O. Fulia Colony, Dist: Nadia-741402, West Bengal has declared that he has developed RADHATILAK of Rice (*Oryza sativa* L.) as Farmer plant variety and that he is the true breeder thereof (or the legal representative or assignee of the true breeder) and that he is entitled to a plant variety right on the said variety, having regard to the provisions of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 and that there is no objection to the registration of plant variety in favour of him.

And whereas he has, by an application, requested that registration of Farmer plant variety may be allowed to him for the said plant variety;

And whereas he has, by and in his application, particularly described the various distinctive features and mentioned the denomination of the said plant variety;

Now, these presents that the above said applicant (including his legal representatives and assignees or any of them) shall, subject to the provisions of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 and the conditions specified in section 47 of the said Act, and the conditions and provisions specified by any other law for the time being in force, from the 12th day of June, 2024, have the exclusive right to produce, sell, market, distribute, import or export the variety for initial term of Six years & renewable for the remaining years and of authorizing any other person to do so, subject to the conditions that the validity of this registration is not guaranteed and that the fee prescribed for the continuance of this registration are duly paid.

इसके साक्ष्य स्वरूप रजिस्ट्रार ने वर्ष 2024 के जून माह की 12 तारीख को पंजीकरण पर मुहर लगाई है। In witness thereof, the Registrar has caused this registration to be sealed as of the 12th day of June, 2024.

डी. के. अग्रवाल / D. K. Agarwal
रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर व मुहर/ Seal and Signature of the Registrar,
पौधा किस्म रजिस्ट्री/ Plant Varieties Registry

टिप्पण/Note: इस पंजीकरण को बनाए रखने के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है तो वर्ष 2025 के जून माह की 12 तारीख को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष उसी तारीख को देय होगी। The fees for maintenance of this registration, if it is to be maintained, will fall due on 12th day of June, 2025 and on the same day in every year thereafter.

E-mail: ppvfra-agri@nic.in; Website: www.plantauthority.gov.in

চাষের এলাকা

সাম্প্রতিক সমীক্ষার ভিত্তিতে, রাধাতিলক ধান নদীয়া, হুগলী, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগণা ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে অল্প পরিমাণে চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি দপ্তরের অধীনে কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ফুলিয়া, নদীয়ার তরফে রাধাতিলক চাষের প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণের পর, পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনার অধীনে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বীজ বিতরণ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রাধাতিলক ধান চাষের প্রসারের চেষ্টা চলছে।

এছাড়া বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ২০১৩ সাল থেকে ‘বাংলার সুগন্ধি ধান’ প্রকল্পের মাধ্যমে দক্ষিণবঙ্গের ৭টি জেলাতে (নদীয়া, হুগলী, পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ও

সারণি ৩ ঃ 'বাংলার সুগন্ধি ধান' প্রকল্পের অধীনে প্রযুক্তি সহায়তাভিত্তিক 'রাধাতিলক' ধানের চাষ (২০১৩-২০২৫)

জেলা	ব্লকের সংখ্যা	কৃষকের সংখ্যা			জমির পরিমাণ (বিঘা)		
		২০১৩ - ২০১৭	২০১৮ - ২০২২	২০২৩ - ২০২৫	২০১৩ - ২০১৭	২০১৮ - ২০২২	২০২৩ - ২০২৫
নদীয়া	১০	৪১১	৪৪৭	২০৫	২৬৭	২০২	১৪১
হুগলী	৪	৭৪	৬২	১৬	৫৩	৪৩	১০
পূর্ব বর্ধমান	৪	১৬	১৫	-	১৪	১৪	-
মুর্শিদাবাদ	৬	৬৬	৬৯	-	৩৪	৪৫	-
পূর্ব মেদিনীপুর	৫	৭	৭১	২১	৩	৫২	১৩
পশ্চিম মেদিনীপুর	১	৭	-	-	৩	-	-
উত্তর ২৪ পরগণা	৫	-	২৫	৩৩	-	১৭	২১
মোট	**৩৬**	**৫৮১**	**৬৮৯**	**২৭৫**	**৩৭৪**	**৩৭৩**	**১৮৫**

নদীয়া ঃ চাকদহ, হরিণঘাটা, কল্যাণী, রানাঘাট ১, রানাঘাট ২, শান্তিপুর, হাঁসখালি, কৃষ্ণনগর ১, নাকাশিপাড়া, তেহট্ট ১
হুগলী ঃ পাণ্ডুয়া, বলাগড়, চুঁচুড়া, ধনেখালি
পূর্ব বর্ধমান ঃ মেমারি ১, রায়না ১, বর্ধমান ২, আউশগ্রাম ১
মুর্শিদাবাদ ঃ ভরতপুর ১, ভরতপুর ২, জলঙ্গী, নবগ্রাম, রানিনগর ১, লালগোলা
পূর্ব মেদিনীপুর ঃ পাঁশকুড়া, নন্দকুমার, পটাশপুর ২, ভগবানপুর ২, রামনগর ২
পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ নারায়ণগড়
উত্তর ২৪ পরগণা ঃ গাইঘাটা, সন্দেশখালি ১, সন্দেশখালি ২, মিনাখাঁ, বারাসাত ১

উত্তর ২৪ পরগণা) বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, ফার্মার্স ক্লাব প্রভৃতির সাহায্যে বীজ বিতরণ, প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সুসংগঠিত রাধাতিলক চাষের ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে (সারণি ৪ ও চিত্র ৩)।

'রাধাতিলক' চালের প্যাকেটের উদ্বোধন ও বিপণন উদ্যোগ

রাধাতিলক চালের বাণিজ্যিক প্রসারের দিকটি অনুধাবন করে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে একটি 'উৎপাদন থেকে বিপণন শৃঙ্খল' তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কৃষকদের জমিতে উৎপাদিত ছোট দানার রাধাতিলক ধান বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহনপুরস্থিত উন্নতমানের রবার হলারযুক্ত যন্ত্রে চাল প্রক্রিয়াকরণ করার ব্যবস্থা রয়েছে। এতে প্রাপ্ত চালের মধ্যে সম্পূর্ণ বা আস্ত চালের শতকরা পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ও চালের শুভ্রতা বজায় থাকে। উক্ত চাল বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার নামাঙ্কিত প্যাকেটে ভরার ব্যবস্থা করা হয়। ২০১৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী কল্যাণীতে অবস্থিত ফার্মার্স অ্যাকাডেমি এ্যাণ্ড কনভেনশন সেন্টারে (লেক হল) অনুষ্ঠিত 'উদ্ভিদ প্রজাতির সুরক্ষা ও কৃষকের অধিকার আইন ২০০১' বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা শিবিরে 'রাধাতিলক' চালের প্যাকেটের উদ্বোধন করা হয় - যা বাংলার সুগন্ধি ধানের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় (চিত্র ৪ ও ৫)। পরবর্তীকালে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের

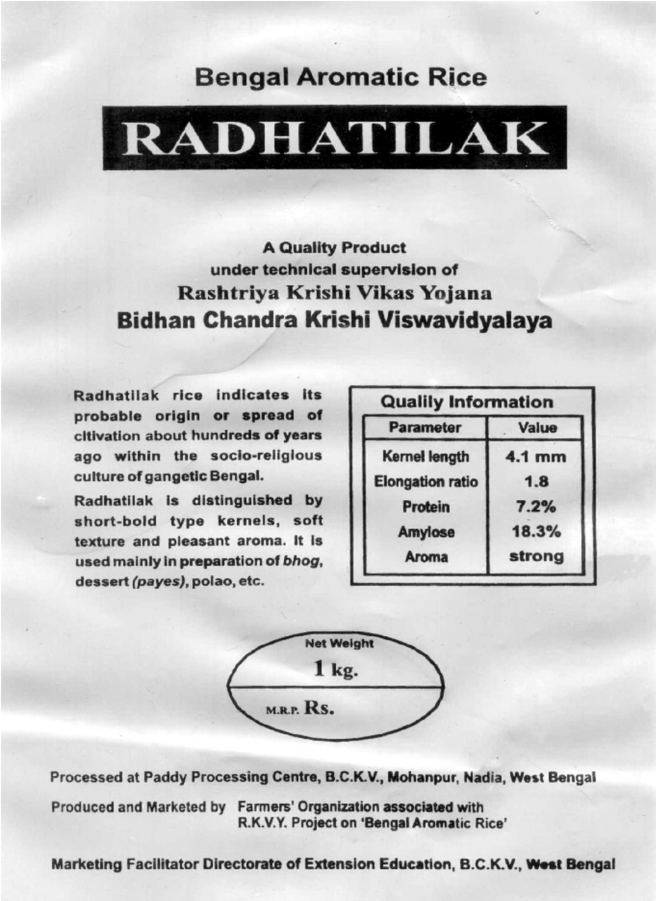

সম্প্রসারণ শিক্ষা অধিকরণের বিক্রয়কেন্দ্রে এবং দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে অনুষ্ঠিত কৃষিমেলা, বাণিজ্যমেলা প্রভৃতিতে উক্ত প্যাকেট প্রদর্শন ও বিক্রি করা হচ্ছে। এই ব্যবস্থার পাশাপাশি রাধাতিলকের বাণিজ্যিক প্রসারের জন্য রাজ্য সরকারের কৃষিজ বিপণন দপ্তর পরিকল্পনামাফিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রচেষ্টায় ২০১৬ সালে নদীয়ার ৭টি ও হুগলির ১টি কৃষক সংগঠন 'সুফল বাংলার' অধীনে রাধাতিলক চাল সরবরাহের জন্য নথিভুক্ত হয়েছে, যা পরবর্তীকালে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এদের মধ্যে (১) কদমপুর কৃষি ফার্মার্স ক্লাব, (২) শান্তিপুর কৃষি প্রগতি ফার্মার্স ক্লাব, (৩) শান্তিপুর বাসন্তী ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, (৪) নবোদয় ফার্মার্স ক্লাব, (৫) রূপালি ফার্মার্স ক্লাব, (৬) কৃষ্ণনগর এগ্রিকালচার ডেভলপমেন্ট প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন ও (৭) গোপালপুর লর্ড শ্রী চৈতন্য প্রোডিউসার কোম্পানী লিমিটেড, নদীয়া প্রভৃতি রাধাতিলক চাল 'সুফল বাংলা'য় সরবরাহ করছে। এককথায়, রাধাতিলক চাষের প্রসার ও বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কৃষকদের সরাসরি অংশগ্রহণসহ ছোট 'উৎপাদন থেকে বিপণন শৃঙ্খল' গঠন করা হয়েছে, যা ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করছে।

সর্বোপরি, কৃষক সম্প্রদায় ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের এই সমন্বিত উদ্যোগ আরও সংহত ও প্রসারিত করা প্রয়োজন। তাহলে রাধাতিলক ধান চাষের উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নত প্রক্রিয়াকরণ ও সুশৃঙ্খল বিপণন ব্যবস্থা গড়ে উঠবে - যা দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে কৃষি ব্যবস্থায় নতুন উন্নয়নধর্মী পরিবর্তন নিয়ে আসবে।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা ঃ (১) ড. অনুপম পাল, প্রাক্তন অপর কৃষি অধিকর্তা, কৃষি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

(২) শ্রী গৌতম মুখার্জী, প্রাক্তন প্রকল্প অধিকর্তা, সুফল বাংলা, কৃষিজ বিপণন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

যোগাযোগঃ ড. মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ
বিধানচন্দ্র কৃষি বিদ্যালয়, মোহনপুর, নদীয়া
ই-মেল ঃ mghoshbckv@rediffmail.com
মোবাইলঃ 8902711929

সুন্দরবনে গভীর জলের ধান চাষ

ড. অনুপম পাল
প্রাক্তন অতিরিক্ত কৃষি অধিকর্তা
কৃষি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ
দেশজ ফসল ও চাষের প্রবক্তা ও গবেষক

গোড়ার কথা

ভারতবর্ষে এককালে প্রায় একলক্ষের বেশী দেশি জাতের ধান ছিল। আজ মেরে কেটে গোটা ভারতে হয়ত ১০০০ ধান পাওয়া যাবে কৃষকের মাঠে। সেই আঞ্চলিক ধান গুলো নির্বাচন করেছিলেন আমাদেরই পূর্বজ কৃষকরা। খরা, বন্যা প্রবণ এলাকা, লবণাক্ত জমি, গভীর জলের জন্য, সমতল ভূমি ও পাহাড়ি এলাকার জন্য এবং বিভিন্ন মরশুম অনুযায়ী ধানের জাত ছিল। যেমন আউশ, আমন ও বোরো মরশুমের ধান। তথ্য অনুযায়ী সাবেক অবিভক্ত ২৪ পরগণা জেলায় ১৬০ রকমের বেশী দেশী ধান ছিল। মাত্র কয়েকটি ধান আজ কৃষকের মাঠে পাওয়া যায়। বোরো মরশুমের গভীর জলের জন্য ধান ছিল গুলিগাটি। দক্ষিণ ২৪ পরগণার ফলতা ব্লকে ১৯৯৪ সালে চাষ হত। জলের ধান পরাঙ্গী ধান আমতলার কাছে বিষ্ণুপুর ব্লকে চাষ হত ১৯৯৫-৯৬ সালেও। আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। বন্যার পর ভাদ্রমাসের শেষে নদীর চরে লাগানোর ধান ছিল গানজিয়া। গঙ্গার নদীর সাথে যুক্ত খাড়ি দিয়ে আসা জোয়ারের ঠেলা জলে দক্ষিণ পরগণার বিভিন্ন ব্লকে বোরো ধানের চাষ হয়। ভাদ্রমাসে ধান লাগানো যায় কামিনি ভোগ ও দুধের সর। কিছু ধান আছে যেমন কম লবণ সহ্য করতে পারে কিন্তু উৎপাদন বেশি। কিন্তু সুন্দরবন অঞ্চলে দরকার লবণ বেশি সহ্যকারী ধান, উৎপাদন কম হলেও চলবে। বলা বাহুল্য দেশী ধানের চাল পুষ্টিকর। মুড়ি, খই, পান্তাও খুব ভালো হয়। ধানের খোসা মোটা, জলে থাকলেও সহজে অঙ্কুরোদগম হয় না। কাটার সময় আধুনিক জাতের ধানের শীষে জল পড়লেই গাছেই পরিপক্ক ধানের অঙ্কুরোদগম হয়ে মুরগীর খাবারে পরিণত হয়। উল্লেখ্য সুন্দরবনের বহু সচেতন কৃষক ও কৃষক গোষ্ঠীর কাছে দেশী ধান চাষ করছেন। সুন্দরবনের জমি অপেক্ষাকৃত নীচু। জল সহজেই জমে যায়।

কৃষি ব্যবস্থাকে অলাভজনক করে রাখা হচ্ছে, যাতে কৃষকরা গ্রাম থেকে ভিন রাজ্যে পাড়ি দেয় মজুরের কাজে, শহর তৈরীর কাজে। কৃষিকাজে এখন অনেক অনিশ্চয়তা, রোজগারেও অনিশ্চয়তা। কিন্তু আশার আলো আছে। প্রয়োজন বাজারী রাসায়নিক উপকরণ বাদ দিয়ে সঠিক কৃষি পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ব্যয় কমানো এবং উপযুক্ত বিপনন। পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া ধান চাষে করা যায় না। এই পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রাখতে পারলে কৃষকদের অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত উন্নতি ঘটে।

সুন্দরবনের ধান ঃ

সুন্দরবনের গভীর জল এবং লবণাক্ততা প্রায় সমার্থক। এখানকার গভীর জলের ধানগুলি লবণ সহ্য করতে পারে। বর্ষায় জল বেশী থাকলে লবণের সমস্যা কমে যায়। জল কম থাকলে বা নতুন করে বাঁধ ভেঙে নোনা জল ঢুকলে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লবণাক্ততা বেড়ে যায়। পরের বছরও প্রভাব থাকে। ধান সাধারণত ৬ - ৮ ডেসি সিমেন্স (মিলিমোহস) পর্যন্ত লবণ সহ্য করতে পারে বৃদ্ধির মধ্যবর্তী পর্যায়ে ছোট অবস্থায় নয়। এর অর্থ হল ৩- ৪ গ্রাম লবণ প্রতি লিটার জলে। লবণ কিন্তু মাপা হয় থিতিয়ে পড়া মাটি গোলা জল থেকে। সুন্দরবনের ডাঙ্গা জমি মানে অন্য জায়গার নীচু জমি। গভীরজলের ধানের মেয়াদ কম বেশী প্রায় ১৫০ দিন। আবার অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে কেরালা সুন্দরীর মত বেশী ফলনের ১৩২ দিনের ধানও সম্ভব। দেশী ধানে রোগ পোকা লাগে না। জমিতে জল কমে গেলে অনেক ধান পড়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে আবার ধান আখের মত বেঁধে দেওয়া হয় যাতে সহজে না পড়ে যায়। পড়ে যাওয়াটা গাছের বেঁচে থাকার চেষ্টা, লম্বা গাছের মাথা ভারী হয়ে যায়। নীচে জল থাকলে ধান নষ্ট হয়, বিবর্ণ হয়ে যায়।

পরিষ্কার জলে ৬ - ৮ ইঞ্চি গভীর

জলে বীজতলা করা হয়। চারা লাগানোর পর জলের উপরে সামান্য পাতা বেরিয়ে থাকলে জল বাড়ার সাথে গাছও বাড়তে থাকে। গভীর জলের ধানের সাথে ভেসে থাকা ধানের একটা মিল আছে। লাউ লতা, লাউকলমি, নামের কিছু ধান ছিল যেগুলোর কাণ্ড ফাঁপা এবং জলের উপর কলমি শাকের মত ভেসে থাকতে পারে। এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের গভীর জলের রায়দা ধান খরা, বন্যা ও ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে। ৬ ফুটের বেশী জলের নীচে বেঁচে থাকতে পারে। এক বছর লাগে পাকতে। জলের নীচে অন্য ধানের মত পর্বমধ্য বাড়ে। এস আর ২৬ বি, ক্যানিং ৭, মাতলা, হ্যামিলটন ইত্যাদি লবণ সহনশীল ধান নির্বাচন করা হয়েছিল। সম্প্রতি চুঁচুড়া ধান গবেষণা কেন্দ্র থেকে ছাড়পত্র পাওয়া গোসাবা ৫ ধানটি লবণ সহনশীল। এর আগে ছিল লুনিশ্রী। আয়লার পরে আশানুরূপ ফল দেখতে পারে নি। লুনা স্বর্ণ ধান, সি আর ধান ৫০৫ প্রচলিত সরকারি লবণ সহনশীল ধান। এফ আর ১৩ এ ধানের থেকে পাওয়া সাব-১ জিন থেকে মার্কার এসিস্টেড ব্রিডিং এর দ্বারা স্বর্ণ ধান থেকে তৈরি করা হয় স্বর্ণ সাব-১ ধান। গভীর জলের শক্ত কাণ্ডের আধুনিক স্বর্ণ সাব-১ ধানের উচ্চতা ৩.৫ ফুট, ধান হেটোকেনো দিতে পারে না। ওই ধানের অনেক প্রচার হয়েছিল কিন্তু বাস্তবে কৃষকের মাঠে কাজে আসে নি।

জলের নীচে কেমন করে দেশী ধান বাঁচে ঃ

> **গভীর জলে ধানগুলো জলের নিচু ডুবে থাকা অবস্থায় বৃদ্ধি হয় এবং জল বাড়ার সাথে সাথে বেড়ে চলে আস্তে আস্তে। কার্তিক মাসের মাঝামাঝি বা শেষ দিকে জলের উপরে শীষ বের করে দেয় অনেকটা সাপের ফণার মতো ঝুঁকে থাকে। এটাকে বলে হেটো কেনো দেওয়া বা হামাগুড়ি দিয়ে চলা পদ্ধতি (kneeing)।**

ফুল আসে দিন যখন ছোট হয়। জলের নীচে গাছের গোড়া থেকে জলের উপরে থাকা গাছের শীষ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য হয়ে যায় ১০ ফুট, বাইশ ফুটও হতে পারে। যেমন বিশ বাইশ ধান। জলের ভিতরে গাঁট থেকে শিকড় ও পাশকাঠি বের হয়। পর্বমধ্য বড় হতে থাকে। কান্ডে বাতাস ভর্তি কলা যুক্ত এরেনকাইমা টিসু থাকে। ব্যাপন ক্রিয়া সহজে হয়। পাতা, কাণ্ড ও শিকড়ের শ্বসন ঠিক হয়। এর জন্য একটি বিশষে জিন সাব-১ দায়ী। কোন আধুনিক বেঁটে জাতে ধানের এই হেটো কেনো দেওয়ার ক্ষমতা নেই। অর্থাৎ জলের নিচে বাড়ার ক্ষমতা নেই। এটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জলের নিচে পাতায় যদি সূর্যালোক ঠিকভাবে পড়ে তাহলে পাতা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া মাধ্যমে বৃদ্ধিকে জারি রাখবে অর্থাৎ বেঁচে থাকবে। কিন্তু জল যদি ঘোলা হয় এবং সেখানে কোন ধানই বাঁচবে না। অর্থাৎ পাতার উপরে যদি কাদার আস্তরণ পড়ে যায় তাহলে দেশী ধানের সালোক সংশ্লেষ না হওয়ার জন্য বৃদ্ধি হবে না, তাই ধান বাঁচবে না। স্থির ভাবে

গভীর জলের দেশী ধানের তালিকা

বৈশিষ্ট্য ১	উপযুক্ত ধানের জাত	বৈশিষ্ট্য ২	উপযুক্ত ধানের জাত
১-২ ফুট বহমান জল সহ্য করতে পারে। চারা অবস্থায় নয়। গাছের পাতা জলের উপরে সামান্য উপরে থাকে, গাছের বৃদ্ধির সাথে একদিকে হেলে যায়। মাসাধিক কাল এই রকম জল থাকে। সামান্য লবণ সহ্য করতে পারে।	মেঘি, জলজাবড়া, কলামোচা, সোলে, সবিতা (দেশী ধান থেকে নির্বাচিত), হোগলা, মৌল, কালরিাই, নিকো, তিলক কাছাড়ি, হামাই, লীলাবতী, ঝুমপুরি, পাটনাই ২৩, কুটে পাটনাই, কেরালা সুন্দরী, মাতলা, হ্যামিলটন। দেরীতে ভাদ্র মাসে দুধের সর, কামিনী ভোগ লাগানো যায়।	৩ ফুট বা তার বেশী জল সহ্য করতে পারে। জলের নীচেও কয়েকদিন বেঁচে থাকতে পারে। হড়মানোনা, লক্ষীদীঘল ও জল জাবড়া ৫ ফুটের বেশী লবণমুক্ত জল সহ্য করতে পারে।	মেঘি, কালোমোটা, নোনা বোখরা, বরান খেঁজুরছড়ি, কাটারাঙী, হড়মানোনা, কালিরাই, জলজাবড়া, ঝুমপুরি, শালকেলে ইত্যাদি। জল থাকলে ঝুমপুরি ধান দাড়িয়ে থাকে, বেশী ফলন হয়।

জল দাঁড়িয়ে থাকলে কাদা সরবে না। বৃষ্টি হলে বা জল আন্দোলিত হলে পাতার কাদা অনেকটা ধুয়ে যায় এবং গাছ বেড়ে উঠতে পারে। জলের স্রোত চলতে থাকলে কোন সমস্যা নেই। পাতার কাদা ধুয়ে যাবে ধীরে ধীরে। আগে গভীর পরিষ্কার জলের জায়গায় ধানের চারার গোড়ায় কাদার বল করে গভীর জলে নৌকা থেকে ফেলে দেওয়া হত। পরে সেখান থেকেই গাছ গজিয়ে উঠত।

ধান মাছ ব্যবস্থাপনা ঃ

আধুনিক রাসায়নিক ও পুঁজি নির্ভর কৃষির বিকাশের সাথে দেশি ধানগুলোর বিলুপ্তি একই সূত্রে গাঁথা। জলমগ্ন ধান-বাস্তুতন্ত্রও লোপ পেয়ে গেল। জলমগ্ন জমিতে ধান এবং মাছ খুব স্বাভাবিকভাবেই জন্মায়। তাই বাঙালির পাতে মাছ ও ভাত। ধান মূলত জল পছন্দ করা ফসল। তার মানে ধান চাষ করতে গেলে জলমগ্ন জমি লাগবেই এমনটা নয়। ধান ও মাছের এলাকার কৃষকরা ধানের মরশুমে হাট থেকে মাছ কিনতেন না। ধানের জমি থেকেই বিভিন্ন ধরনের মাছ সংগ্রহ করতেন। সমীক্ষায় দেখা গেছে ধানের জমিতে প্রায় ৪৭ রকমের

সুন্দরবনের দেশী ধান বৈচিত্র্য

জাতের নাম	মেয়াদ-দিন (ধান ভেজানো থেকে কাটা)	ফলন মন / বিঘায় (৩৩ শতক)	মন্তব্য এক কালি করে চারা রোপন করে ও শুধু জৈব সার ভাসমান আজোলা প্রয়োগ করে এই ফলন হয়। জমি ভেদে ফলন এর কম বেশী হতে পারে। রাসায়নিক সার ও বিষ কিছুই লাগবে না।
গভীর জল - ধানও মাছ চাষের উপযোগী, লবণ সহনশীল			
ভাসা কলমি	১৫০	১২	মাঝারি চাল, খড় ভালো হয়, ভালো মুড়ি হয়, ১ - ২ ফুট জল সহ্য করতে পারে।
মরিচশাল	১৫৩	১৩	মাঝারি চাল, খড় ভালো হয়, ভালো মুড়ি হয়, ১ - ২ ফুট জল সহ্য করতে পারে, জল থাকলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।
ঢ্যাপা	১৪৪	১৩	মাঝারি চাল, খড় ভালো হয়, ভালো মুড়ি হয়, ১ - ২ ফুট জল সহ্য করতে পারে।
কুমড়াগোড়	১৫২	১৩	মোটা চাল, খড় ভালো হয়, ভালো মুড়ি হয়, ১-২ ফুট জল সহ্য করতে পারে।
খেঁজুর ছড়ি (গুচ্ছ)	১৪১	১৩	মাঝারি চাল, ১-২ ফুট জল সহ্য করে।
বরান খেঁজুর ছড়ি	১৪২	১৩	লালচে ধান, গুচ্ছ ধান নয়, মোটা চাল, পান্তা ও মুড়ি হয়, জল সহ্য করে
কাটারাঙ্গী	১৫০	১০	লাল চালেরও একটি জাত আছে। ৪ ফুট জল সহ্য করতে পারে। ভাত, পান্তা ও মুড়ি ও ধানের সাথে মাছ। জল থাকলে দাঁড়িয়ে তাকে।
হামাই	১৪৮	১০	মোটা চাল, খড় ভালো হয়, ভালো পান্তা ও মুড়ি হয়, ১ - ২ ফুট জল সহ্য করতে পারে, হোগলা, ঘিওস ও মালাবতী একই ধরনের।
তালমুগুর	১৪৪	১০	লাল চাল, ওষধি গুণ সম্পন্ন, পুষ্টিকর, ভালো পান্তা ও মুড়ি হয়, মাছও হয় জমিতে।
লালগেতু	১৪৪	১০	মোটা সাদা চাল, পুষ্টিকর, ভালো পান্তা ও মুড়ি হয়, ১ ফুট জল সহ্য করতে পারে মাছও হয় জমিতে।
নোনাবোখরা	১৪২	১১	মোটা সাদা চাল, পুষ্টিকর, ভালো পান্তা ও মুড়ি হয়, ১-২ ফুট জল ও লবণ সহ্য করতে পারে মাছও হয় জমিতে।
কৈজুড়ি	১৪২	১১	মোটা সাদা চাল, পুষ্টিকর, ভালো পান্তা ও মুড়ি হয়, ১ ফুট জল ও লবণ সহ্য করতে পারে, মাছও হয় জমিতে।
ভাসামানিক	১৪২	১৩	মাঝারি চাল, খড় ভালো হয়, ভালো মুড়ি হয়, ১ ফুট জল সহ্য করতে পারে।
তিলককাছারি	১৪৩	১৩	মোটা চাল, খড় ভালো হয়, ভালো মুড়ি হয়, ১ ফুট জল সহ্য করতে পারে।

জলজ প্রাণী পাওয়া যায়। তার মধ্যে চিংড়ি ছাড়া গেড়ি গুগলি, কাছিম, শামুক ইত্যাদি আছে। চ্যাং, চুনো মাছ, মৌরালা মাছ, ন্যদোশ ও পুটি খুব সহজলভ্য ছিল। এগুলো হলো সহজলভ্য প্রোটিনের উৎস। এক বিঘা জমিতে কম করে তিন মাসে এমনিতেই ৪০ কেজি বিভিন্ন মাছ পাওয়া সম্ভব। মাছের বর্তমান বাজার দর দেড়শ টাকা কেজি ধরলে ছয় হাজার টাকা হয়। ধান সেখানে কম করে - ছয় থেকে সাত মণ হয় ৩৩ শতকে। আর বীজটা ও বংশপরম্পরা ধরে চলবে। ধানের জমিতে ২২ রকমের সহযোগী উদ্ভিদ জন্মায়। অনেক উদ্ভিদ শাক হিসেবে মানুষ খায়, গোখাদ্য হিসেবে এবং নিড়ানীর সময় জমিতে পচিয়ে জৈব সার তৈরী করা হয়। এই সম্পদটাকে ঘাস মারা বিষ দিয়ে নষ্ট করা হচ্ছে। জলমগ্ন ধান-বাস্তুতন্ত্রও বিপন্ন। ধান-মাছ ব্যবস্থাপনা কৃষি বাস্তুতন্ত্র ও কৃষি অর্থনৈতিক দিক থেকে সব থেকে লাভজনক।আজ তা বিপন্ন।

সুন্দরবন বিভিন্ন ব্লকে দেশী ধানের চাষ হচ্ছে। লবণ সহনশীল নয় এমন দেশী ধানেরও চাষ ভালো ভাবেই হচ্ছে। দুধেরসর, পাটনাই-২৩, ঝিঙেশাল, চামরমণি, লাল দুধের সর, সুরেশ পাটনাই, সবিতা, কবিরাজশাল, বালাম ইত্যাদি সরু চাল এবং মোটা চাল। কম লবণ বা লবণবিহীন অঞ্চলের জন্য - ১ফুট জল, বহুরুপী, কেরালা সুন্দরীর চাষ হচ্ছে।

প্রাক প্রস্তুতি

জৈষ্ঠ্য মাসের প্রথমে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ার পর কম লবণ যুক্ত জমিতে সবুজ সারের জন্য বিঘা প্রতি ৪ কেজি ধনচের বীজ চাষ করে ছিটিয়ে বুনতে হবে। দেড় মাস পরে আষাঢ়ের শেষে এক হাঁটু উচ্চতার ধনচে গাছকে চাষ করে জমির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। পরে আরো দু চাষ দিয়ে ধান রোয়া করতে হবে।

বীজশোধন ঃ

বীজ ধান চৈত্র-বৈশাখ মাসে রোদ খাওয়াতে হবে। চারা ফেলার আগেও বীজকে রোদ খাওয়ানোর পর ঠাণ্ডা করে পাত্রে রাখতে হবে। কুলো ঝাড়া করে খারাপ, অপুষ্ট , অন্য বীজ ও নোংরা বাদ দিতে হবে। লবণ জলে (৩ লিটারে ৩০০ গ্রাম লবণ) দিয়ে গামছায় পুঁটলি করে ১ কেজি ডুবিয়ে দিয়ে নাড়া চাড়া করলে প্রায় ১০০ গ্রাম ভেসে ওঠা চিটে ধান বেরিয়ে যেতে পারে। ভারী ধানকে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিতে হবে কয়েকবার। যাতে কোন লবণের অবশেষ না থাকে। সরাসরি গোচানায় বা জল মেশানো গোচনায় এক রাত ভিজিয়ে রাখার পর জাঁক দিতে হবে। এর ফলে বীজের অঙ্কুরোদগম ভালো হয়। অঙ্কুরিত বীজ বীজতলায় ফেলতে হবে। পাখির উপদ্রব থেকে বাঁচতে জমির উপরে জাল দিতে হবে বা কাঠের ছাই ছড়াতে হবে। অনেকে বীজ অঙ্কুরিত না করে বীজ শোধন করেই বীজ তলায় ছিটিয়ে দেন।

বীজের পরিমান ও বীজ তলা ঃ

জৈষ্ঠ্য মাসে এক পশলা বৃষ্টির পর চাষ করে মাটিতে বীজ ছিটিয়ে বুনলে ৬ কেজি বিঘায়, কাখড়ি বীজ তলা (শুকনো) করলে ৪ কেজি বীজ, প্রথাগত কাদানো বীজ তলায় ৪ কেজি বীজ ফেলা হয় ৩৩ শতক জমির জন্য। তিন চারটি চারা দিয়ে রোয়া করা হয়। অনেক বেশী বীজ দেওয়া হয়। এক কালি করে চারা লাগাতে হলে বিঘায় ১ কেজি বীজ যথেষ্ট। গোবিন্দভোগের মত ছোট ধান হলে ৪ ফুট বাই ১২ ফুট বীজতলায় ২৫০ গ্রাম বীজ ফেলতে হবে, ৪টি বীজ তলা হলে ১ বিঘায় রোয়া যাবে। কেরালা সুন্দরীর মত মোটা ধানের ক্ষেত্রে ৪ ফুট বাই ১২ ফুট বীজ তলায় ৫০০ গ্রাম বীজ ফেলতে হবে। ২টি বীজ তলা হলেই এক বিঘা জমি রোয়া করা যাবে। ২টি আপতকালীন বীজ তলায় ২০০ গ্রাম করে মোট ৪০০ গ্রাম বীজ ফেলতে হবে, গোবর সার দিয়ে বীজতলা খুব হালকা রাখতে হবে। এখানে চারা ৪০ দিনের বেশী রাখতে হবে। খরা হলে বা অতি বৃষ্টিতে চারা লাগানো যাবে না। প্রাকৃতিক সমস্যা মিটলে পাশকাঠি সহ পুরো ধানের গোছ তুলে ১ ফুট দূরে দূরে ধানের গোছগুলি লাগাতে হবে মূল জমিতে। কিছুটা জমিতে অন্তত লাগানো যায়। একে বলা হয় সুধা পদ্ধতি। চারা কম পড়লে পাশকাঠি ভেঙে লাগাতে হবে। এক কেজি মোটা থেকে মাঝারি ধান সংখ্যায় হয় ৪২০০০ - ৫০০০০ হাজার। আর সুগন্ধি গোবিন্দভোগ ধানের হয় ১ লক্ষ। এক ফুট বাই এক ফুট অন্তর চারা লাগালে ৩৩ শতকের এ বিঘা জমিতে মোট ধানের চারা লাগবে ১৪৯৮৮টি, ১২ ইঞ্চি বাই ৮ ইঞ্চি দূরে লাগালে চারা লাগবে ১৭৯৮৬টি। সুতরাং বিঘায় এক কেজি ধানই যথেষ্ট। **বন্যা প্রবণ এলাকা বা অতি বৃষ্টির জন্য জলের উপর কচুরিপানা ও মাটি দিয়ে ভেলা তৈরী করে ধানের বীজতলা করা যায়।**

রোয়ার জন্য জমি তৈরী ঃ

তিন বার চাষ করতে হবে ২ - ৩ দিন বাদ দিয়ে। প্রথম চাষে ৮০০ কেজি গোবর সার, ৫০ কেজি ধান মিলের ছাই দিতে হবে। ধনচে চাষের সুবিধা থাকলে এক পশলা বৃষ্টির পর এক বার চাষ করে ৪ কেজি বীজ ছিটিয়ে দিতে হবে। ৪৫ দিন পর জমিতে চাষ দিতে হবে। জমিতে ৪ - ৫ টি ধনচে গাছ রেখে দিতে হবে পাখি বসার জন্য। এখান থেকে ধনচে বীজও হবে।

রোয়া ঃ

এক কাঠি চারা রোপণ পদ্ধতি - অবস্থা বুঝে ২০ দিনের এক ফুট

দৈর্ঘ্যের চারা একটি করে ১২ ইঞ্চি বাই ১২ ইঞ্চি দূরে লাগাতে হবে লাইন করে। জলের মধ্যেই পাশকাঠি হয় ২০-২২টা। ৩- ৪টি করে চারা লাগালে পাশকাঠি সংখ্যা কম হবে। ফলন কম হবে। উঁচু জমি হলে ১২ ইঞ্চি বাই ১০ ইঞ্চি দূরে লাগাতে হবে। এক কাঠি চারা রোপণ পদ্ধতিতে প্রথম প্রথম অসুবিধা হলেও আখেরে লাভ হয়। বৃষ্টি বা খরার জন্য দেরী হলে, দেরীতে বৃষ্টি আসার পর আপতকালীন বীজতলা থেকে পুরো গোছ তুলে সুধা পদ্ধতিতে লাগাতে হবে। রোয়ার পর জমিতে কাঁকড়ার উপদ্রব হলে মহুয়া বা নীমখোল ব্যবহার করতে হবে। কিছু চারা রেখে দিতে হবে মরে যাওয়া বা নষ্ট হওয়া চারার শূন্য স্থান পূরণের জন্য। রোয়ার দূরত্বের উপর নির্ভর করে চারার সংখ্যা। এক কলি চারা রোপণ পদ্ধতিতে এক বিঘা জমিতে মোট ধানের চারা থাকবে ১৪৯৮৮ - ১৭৯৮৬ টি।

নিড়ানী ঃ

অন্তত দুবার করতে হবে ২২ দিন পর, ৪২ দিন পর। তরল সার স্প্রে করতে হবে ১০ দিন অন্তর। জল বেশী থাকলে করা যাবে না। আল বাঁধা থাকলে জমিতে ২ কেজি আজোলা ছেড়ে দিন। জমি ভরে যাবে ১০ দিনের মধ্যে, এর থেকে নাইট্রোজেন, পটাশ, অণুখাদ্য ও জৈবসারের যোগান হবে। আগাছাও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। বিশেষ করে রুস্নে। ১২০ দিনের বেশী মেয়াদের ধান গাছ বড় হয়ে গেলে রোয়ার ৫০-৬০ দিনের মধ্যে পাতা ১ ফুট কেটে দিতে হবে বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য। ধানের কাটা পাতা গোখাদ্য হিসাবে গরুকে কয়েকবার খাওয়ানো যাবে। খাড়া নামক আনথোসায়নিন সমৃদ্ধ বেগুনী পাতার কচি পাতা বেসনে ভেজে বড়া করে খাওয়া যায়।

তরল সার ঃ

মাটির খাদ্য ঃ ৫০ লিটার মাটির জ্বালায় ৪ কেজি গোবর, ৪ লিটার গোচনা, ২০০ গ্রাম কৃষিবিষ ও সার বিহীন মাটি, ২০০ গ্রাম টক দই, ২০০ গ্রাম বেসন, ২০০ গ্রাম গুড় দিয়ে জল দিয়ে ভর্তি করতে হবে। রোজ নাড়তে হবে লাঠি দিয়ে। ১৫ দিন পর গন্ধ কম হলে পুরোটাই জমিতে ছিটিয়ে দিতে হবে প্রথম চাষে। তরল সার আসলে মাটির জীবাণু সংখ্যা বৃদ্ধি করে নেওয়ার পদ্ধতি এবং মাটির খাবার হিসেবে দেওয়া হয়। যদি জমিতে আল দেওয়া থাকে। আবার অন্য ভাবে এটা মশারির মত ছিদ্র যুক্ত কাপড় দিয়ে ভালো করে ছেঁকে নিয়ে ১ লিটারের সাথে ৩ লিটার জল মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে ২ - ৩ বার। গাছের বৃদ্ধি ভালো হবে।

রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণ ঃ

সাধারণত দেশী ধানে রোগ পোকা লাগে না। দেশী ধানে বা অন্যান্য দেশজ ফসলে রোগ পোকা লাগে না। রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা আধুনিক জাতের ফসলে রোগ পোকা লাগে। মাটি যদি জৈবিক ভাবে সক্রিয় থাকে, পর্যাপ্ত অনুজীব থাকে, তাহলে ফসলে রোগ পোকা বিশেষ লাগে না। মাটির পি এইচ ৭'র কাছাকাছি, লবণাক্ততা কম ও পর্যাপ্ত জৈব সার ফসলের পোকার হাত থেকে বাঁচাতে পারে। কয়েকটি পদ্ধতি বলা হল।

গন্ধী পোকার আক্রমণে ১০ লিটার জলে ১ কেজি গোবর, ২ লিটার গোচনা ভালো করে ছেঁকে নিয়ে স্প্রে করা উচিত। অন্য সময়ও স্প্রে করা যায়, এতে বৃদ্ধি ভালো হয়। অথবা ১০ লিটার জলের ২ - ৪ মিলি লিটার জলে সিট্রোনেলা তেল বা ১০,০০০ পিপিএম নিম তেল ৪ মিলি সামান্য গুঁড়ো সাবান মিশয়ে স্প্রে করা যায়। সামান্য কেরোসিন তেল মিশিয়ে পচা শামুক কাঠিতে পুটলি করে ঝুলিয়ে রাখলে গন্ধী পোকা ওই পচা শামুমের লোভে যায় এবং মারা পড়ে।

তরল সার স্প্রে করা যেতে পারে। গোচোনা ও রসুন মিশ্রণ - ৫০ গ্রাম রসুন ২৫ মিলি কেরোসিনে এক রাত ভিজিয়ে রাখার পর ছেকে নিয়ে ২ লিটার গোচোনার সাথে ৪ লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে। জমিতে পাখি বাসার জন্য কিছু ধনচে গাছ বসিয়ে রাখতে হবে, পাখি বিভিন্ন পোকা খাবে। বা পাখি বাসার জায়গা করে দিতে হবে।

ইঁদুর নিয়ন্ত্রণ ঃ ইঁদুর মারা কল দিতে হবে। ঢোল কলমি গাছের পাতার রস বা পটলের মূলের রসে ৫০ গ্রাম গম ভিজিয়ে রাখতে হবে এক রাত। ওই ভেজা গম জমির আলে, গর্তের কাছাকাছি দিতে হবে। সিমেন্ট আটা মিশ্রণ -১ ভাগ সিমেন্ট ও ৩ ভাগ আটা মিশিয়ে মাটির সরায় রাখতে হবে। বিড়ালের বিষ্ঠা জমিতে দিতে হবে। একই পদ্ধতি পরপর দু বার ব্যবহার করা যাবে না। তবে ধেড়ে ইঁদুর নিয়ন্ত্রণ করা খুব মুশকিল।

চাষের খরচ ঃ

চাষের খরচ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন। বিঘায় ৪০০০-৭৫০০ টাকা হতে পারে। উত্তর ২৪ পরগণার জোগেশগঞ্জে চাষের খরচ ধরা হয়েছে ৫০০০ টাকা প্রতি ৩৩ শতকের বিঘায়।

ফলন ঃ

জলমগ্ন মোটা ধানের কম করে ৩৩ শতকের বিঘায় ৮ - ৯ মন (৩২০ - ৩৬০ কেজি), সঙ্গে ৩০ কেজি মাছ ও খড় এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি। আবার কেরালা সুন্দরীর মত ধানের ফলন উঁচু জায়গায় ১৮ মন হবে। সুগন্ধী ধানের ফলন উঁচু জায়গায় ১০ মন হতে পারে। অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে দুধেরসর, বালাম, কামিনীভোগের ফলন ১০ মন হলেও দাম বেশী পাওয়া যাবে।

টেকসই কৃষি পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য সময়ে দাবি

বলবন্ত সিং
এম এন ক্রপ ফার্টিকো প্রাইভেট লিমিটেড

ভারতের কৃষি ক্ষেত্র আজ এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। জলবায়ু-অনুকূল চাষাবাদ (ক্লাইমেট-স্মার্ট ফার্মিং), যান্ত্রিকীকরণ এবং ডিজিটাল কৃষিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও, মৌসুমী বায়ুর ক্রমবর্ধমান অনিশ্চিয়তা, তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং ঘন ঘন চরম আবহাওয়া জনিত বিপর্যয় কৃষি উৎপাদনশীলতা ও গ্রামীণ জীবিকাকে ক্রমাগত চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলছে। সম্প্রতি ২০২৬ সালে একটি সম্ভাব্য ঘাটতি মৌসুমী বায়ু বা খরা পরিস্থিতি নিয়ে তৈরি হওয়া উদ্বেগ, একটি স্থিতিস্থাপক (রেজিলিয়েন্ট) এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাকে নতুন করে সামনে এনেছে।

জাতীয় স্তরে, নীতি নির্ধারকরা অতিরিক্ত জল-নির্ভর ফসলের চাষ কমিয়ে ডাল ও তৈলবীজ জাতীয় ফসলের দিকে বৈচিত্র্যায়নের জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন। ভারত সরকার ধানের তুলনায় ডাল ও তৈলবীজের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) অনেক বেশি জোরালোভাবে বৃদ্ধি করেছে, যা আমদানির ওপর নির্ভরতা কমানো এবং সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাকেই প্রতি ফলিত করে।

তবে, টেকসই কৃষির এই আলোচনাকে একটি আঞ্চলিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা প্রয়োজন, বিশেষ করে পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের ক্ষেত্রে, যেখানে অনন্য কৃষি-জলবায়ু পরিস্থিতি একই সাথে চ্যালেঞ্জ এবং নতুন সুযোগ তৈরি করে।

পশ্চিমবঙ্গঃ ধান চাষের আধিপত্য এবং ফসল বৈচিত্র্যায়নের মধ্যে ভারসাম্য

পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যতম প্রধান ধান উৎপাদনকারী রাজ্য। এখানকার উর্বর পলিমাটি, প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং বিস্তীর্ণ নদী অববাহিকা ঐতিহাসিকভাবেই ধান চাষের সহায়ক। তা সত্ত্বেও, কেবল ধান চাষের ওপর এই অতিরিক্ত নির্ভরতা মাটির স্বাস্থ্য, ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ এবং কৃষির লাভের ওপর চাপ বাড়িয়ে দিয়েছে।

বর্তমানে ডাল ও তৈলবীজ চাষে সরকারের নীতগত উৎসাহ পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের জন্য আরও বৈচিত্র্যময় ফসল চাষের পদ্ধতি গ্রহণের একটি বড় সুযোগ এনে দিয়েছে। ধান-ভিত্তিক চাষের সাথে সর্ষে, তিল, মসুর, মুগ, বিউলি এবং সূর্যমুখীর অন্তর্ভুক্তি সুবিধাগুলো দিতে পারে -

জৈবিক নাইট্রোজেন স্থায়ীকরণের (বায়োলজিক্যাল নাইট্রোজেন ফিক্সেশন) মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি।

- একটানা ধান চাষের তুলনায় জলের ব্যবহার হ্রাস।
- ফসল বৈচিত্র্যায়নের মাধ্যমে খামারের আয় বৃদ্ধি।
- অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের কারণে তৈরি হওয়া উৎপাদন ঝুঁকি হ্রাস।

তাছাড়া, রাজ্যে ‘রাইস-ফ্যালো’ অর্থাৎ ধান কাটার পর পতিত জমি চাষের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। খরিফ ধান কাটার পর মাটির অবশিষ্ট আর্দ্রতাকে কাজে লাগিয়ে সেখানে ডাল ও তৈলবীজ চাষ করা সম্ভব। এই ধরনের পদক্ষেপ ভোজ্য তেল এবং ডালের ক্ষেত্রে ভারতের স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

উত্তর-পূর্ব ভারত ঃ টেকসই কৃষির একটি প্রাকৃতিক কেন্দ্র

আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা, অরুণাচল প্রদেশ এবং সিকিস রাজ্য নিয়ে গঠিত উত্তর-পূর্ব অঞ্চলটি একটি অনন্য কৃষি ল্যান্ডস্কেপ তুলে ধরে। এই অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো প্রচুর বৃষ্টিপাত, সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য এবং রাসায়নিক সারের তুলনামূলক কম ব্যবহার।

ভারতের অন্যান্য নিবিড় চাষাবাদ (ইনটেনসিভ কাল্টিভেশন) অঞ্চলের মতো নয়, বরং উত্তর-পূর্ব ভারতের টেকসই এবং জৈব চাষের জন্য প্রাকৃতিক সুবিধা রয়েছে। এই অঞ্চলটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর জন্য অত্যন্ত উপযোগী -

- উপত্যকা অঞ্চলে ডাল ও তৈলবীজ চাষ।
- হলুদ, আদা এবং গোলমরিচের মতো উচ্চ-মূল্যের মশলা চাষ।
- উদ্যানপালন (হর্টিকালচার) এবং ফল চাষ।
- সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থা (ইন্টিগ্রেটেড ফার্মি সিস্টেম), যা ফসল, গবাদি পশু, মৎস্য চাষ এবং কৃষি বনায়নকে একত্রিত করে।
- পাহাড়ি এবং উঁচু এলাকায় জলবায়ু সহনশীল মিলেট (বাজরা/ জোয়ার ইত্যাদি) চাষ।

তবে মূল চ্যালেঞ্জটি হলো বাজার সংযোগ। কৃষকরা প্রায়শই খণ্ডিত সরবরাহ শৃঙ্খল, অপর্যাপ্ত সংরক্ষণ সুবিধা এবং সংগঠিত ক্রেতাদের কাছে সীমিত প্রবেশাধিকারের মতো সমস্যায় ভোগেন। গুদামজাতকরণ, কোল্ড চেইন, লজিস্টিকস এবং ডিজিটাল মার্কেটপ্লেসে বিনিয়োগ এই অঞ্চলকে টেকসই কৃষি পণ্যের একটি প্রধান সরবরাহকারীতে রূপান্তরিত করতে পারে। কৃষি লজিস্টিক এবং ই-কমার্স প্লাটফর্মের দ্রুত বৃষ্টি উৎপাদকদের সরাসরি ভোক্তা এবং প্রক্রিয়াজাতকারীদের সাথে সংযুক্ত করে এই ব্যবধান পূরণ করতে পারে।

প্রযুক্তি, গবেষণা এবং জলবায়ু সহনশীলতা

শুধুমাত্র শস্য বৈচিত্র্যায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব নয়। কৃষি গবেষণা, জলবায়ু-সহনশীল বীজের জাত, প্রিসিশন ফার্মিং প্রযুক্তি এবং আবহাওয়া ভিত্তিক পরামর্শমূলক পরিষেবা গুলিতে ক্রমাগত বিনিয়োগ অপরিহার্য।

কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ভারতীয় অর্থনীতির সুদৃঢ়ীকরণ

অনিন্দিতা কর্মকার[১] এবং স্মৃতিকণা সরকার[২]
[১]সহকারী অধ্যাপিকা, কৃষি কারিগরী অনুষদ,
[২]সহকারী অধ্যাপিকা, শস্য বিজ্ঞান বিভাগ
বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড হল কৃষি। গ্রামাঞ্চলের বহু মানুষ তাদের জীবিকা নির্ধারণের জন্য কৃষি কাজের উপর নির্ভর করে। ভারতীয় জিডিপি-র ১৮ - ২০ শতাংশই আসে কৃষি থেকে। তবে বিভিন্ন সমস্যা যেমন ভূমি খণ্ডিতকরণ, নিম্ন উৎপাদনশীলতা, বাজার দরের উঠা-নামা ইত্যাদি কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আয়ের পরিমান কম এবং অস্থিতিশীল হয়। ফলস্বরূপ, গ্রামাঞ্চলের লোকেদের মধ্যে দারিদ্র্যের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্যার মোকাবিলায় কৃষিজাত পণ্যের মূল্য সংযোজন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। কৃষিতে মূল্য সংযোজন বলতে বোঝায় যে, প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে প্রাথমিক কৃষিজাত পণ্যের (যেমনঃ ধান, গম, ফল, সবজি) বাজার মূল্য বৃদ্ধি করা। যেমন কাঁচা ফল থেকে জ্যাম বা আচার তৈরী করা, বিভিন্ন শস্য থেকে আটা তৈরী করা ইত্যাদি। প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে প্রাথমিক কৃষিজাত পণ্যের গুণগত মান, উপযোগিতা, গ্রহণযোগ্যতা এবং বাজারজাত মূল্য বৃদ্ধি করা হয়।

কৃষিতে মূল্য সংযোজন ঃ কৃষিতে মূল্য সংযোজন শুধু চাষীদের আয়ই বৃদ্ধি করে না, গ্রামাঞ্চলের যুবকদের মধ্যে কাজের সুযোগও বৃদ্ধি করে। খাবার প্রক্রিয়াকরণ হলো কৃষিতে মূল্য সংযোজনের এক অন্যতম উপায়। কয়েকটি প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্যের উদাহরণ হলো - প্যাকেটজাত ফল, সবজি, দুগ্ধজাত দ্রব্য ও রেডি টু ইট মিলস। ভারতে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে, এই বৃদ্ধির ফলে ভারতের চাষীরা মূল্য সংযোজনজনিত বিভিন্ন কার্যবলীতে অংশগ্রহণ করার যথোচিত সুযোগ পাবে এবং প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের বাজার থেকে লভ্যাংশের ফায়দা তুলতে পারবে।

মূল্য সংযোজনের আর একটি অন্যতম উপায় হলো গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র কৃষি ভিত্তিক শিল্প কারখানা তৈরী করা, যেমন তেল নিষ্কাশনের ঘানি, মশলা প্রক্রিয়াকরণের সুবিধা এবং প্রাকৃতিক ফাইবার ব্যবহার করে বস্ত্রবয়ন শিল্প প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। এসবের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে আয়ের সুযোগ বাড়বে এবং গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। উপযুক্ত প্রমাণপত্র থাকলে চাষীরা জৈব চাষ জাত উন্নত মানের ফল এবং সবজি বিক্রি করে প্রচুর আয় করতে পারবে।

মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে সমস্যা

কৃষি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে যে সমস্ত মূল সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হতে হয়, সেগুলো হলোঃ

১) কাটার পর ফসলের অপচয় - কৃষিতে অন্যতম সমস্যা হলো কাটার পর ফসলের অপচয়। প্রক্রিয়াকরণের অভাবে প্রতি বছর ফসল কাটার পর প্রচুর আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। আমাদের দেশে প্রাথমিক পর্যায়ে কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াকরণের হার ৭৫ শতাংশ এবং তার পরবর্তীতে বিভিন্ন 'রিড টু ইট' খাবার প্রস্তুতির হার ২৫ শতাংশ। ভারতে প্রক্রিয়াজাত খাবারের চাহিদা যেখানে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেখানে পরিকাঠামোর অভাবে প্রক্রিয়াকরণ ব্যাহত হচ্ছে।

২) নিয়ন্ত্রিত বাজারের অভাব - আমাদের দেশের বিভিন্ন অংশে নিয়ন্ত্রিত বাজারের সংখ্যায় অনেক তারতম্য দেখা যায়। ভারতে বর্তমানে নিয়ন্ত্রিত বাজারের সংখ্যা হলো

৬,৭৪৬টি, আর দরকার হলো ৪১,০০০ টি বাজারের, নতুন নতুন বাজার তৈরী করা পরিকাঠামোগত ভাবে বা অর্থনৈতিক ভাবে অসম্ভব। তাই যে বাজারগুলো আছে, সেগুলোকেই উন্নত করে চাষীদের আয়ত্তের মধ্যে আনতে হবে।

৩) কৃষিজাত পণ্যের দ্রুত নষ্ট হওয়ার প্রবণতা - বেশিরভাগ কৃষিজাত দ্রব্যের প্রবণতা হলো দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়া বা পচে যাওয়া, বিশেষ করে ফল ও সবজি খুব দ্রুত নষ্ট হয়। তাই এদের সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা উচিত, কিন্তু বেশিরভাগ কৃষকদেরই সংরক্ষণের সঠিক পদ্ধতি জানা থাকে না, এতেও কৃষিজাত দ্রব্যের অপচয়ের পরিমান বাড়ে।

৪) ফসল বৈচিত্র্য - অধিকাংশ কৃষকই প্রচলিত খাদ্যশস্য, ফল এবং সবজির চাষ করে থাকে। কিন্তু যারা বাণিজ্যিক অর্থকরী ফসল চাষের মাধ্যমে অথবা মরসুমি চাহিদা অনুযায়ী ফসল চাষ করে ফসল চাষে বৈচিত্র্য আনতে পারে, তারা সহজেই দীর্ঘমেয়াদী সময় ধরে চাষবাস করে লভ্যাংশ পেতে পারে এবং সহজেই ফসলের ক্ষয়ক্ষতিজনিত সমস্যাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পারে।

৫) বাজার সম্পর্কিত ধারণা - চাষীরা যাতে তাদের উৎপাদিত ফসল থেকে সম্মানজনক লভ্যাংশ অর্জন করতে পরে, তার জন্য তাদের বাজার সম্বন্ধে ধারণা থাকা উচিত। অর্থাৎ কোন ফসল কখন বিক্রি করতে হবে, বাজারে তার চাহিদা বা মূল্য কত - এইসব সম্পর্কে তথ্য থাকা দরকার। কিন্তু ভারতে বেশিরভাগ চাষীর কাছেই এই সম্পর্কে বিশেষ ধারণা থাকে না। বেশিরভাগ সময়েই তারা তাদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে, যা সবসময় সঠিক হয় না। তাই তাদের ক্ষতির মুখেও পড়তে হয়।

মূল্য সংযোজনের বিভিন্ন ধাপ ঃ

প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে প্রাথমিক কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়। বিভিন্ন উপায়ে প্রাথমিক কৃষিজাত দ্রব্যের (শস্য/ফল/সবজি) প্রক্রিয়া করণ করা যায় যেমন গম থেকে মিলিং এর মাধ্যমে আটা এবং ময়দা পাওয়া যায়। একজন বেকার ময়দা দিয়ে গ্রাহকের পছন্দমতো খাবার যেমন পাউরুটি, কেক ইত্যাদি তৈরী করে, কাঁচা গমের চাইতে আটা বা ময়দার দাম বেশি এবং ময়দা বা আটা দিয়ে তৈরী বেকারী বস্তুগুলির দাম আরো বেশি। এইভাবে প্রত্যেকটা ধাপে প্রক্রিয়া করণের পর গমের দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই কৃষকেরা প্রাথমিক কৃষিজাত দ্রব্যের একটা অংশ সরাসরি বিক্রি না করে প্রক্রিয়াকরণের পর বিক্রি করলে বেশি লভ্যাংশ পেতে পারে। তাছাড়াও প্রাথমিক কৃষিজাত দ্রব্য ও প্রক্রিয়াজাত দ্রব্যকে প্যাকেটজাত করে লেবেলিং করাও মূল্য সংযোজনের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক।

ভারতে কৃষিতে মূল্য সংযোজনের অবস্থা ঃ

উন্নতমানের বীজের ব্যবহার এবং আধুনিক কৃষি পদ্ধতি ও জলসেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি স্তরে ভারতে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন প্রচুর পরিমানে বাড়ানো যেতে পারে। উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্যের গ্রাম্য ও শহর স্তরে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ লাভ হতে পারে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের হার (২৫ শতাংশ) ভারতের মধ্যে মহারাষ্ট্রে সবচাইতে বেশি। ওখানে বিভিন্ন ধরনের ফল, সবজি, দুধ, মাছ - সব কিছুরই প্রক্রিয়াকরণ হয় (ভের্মা এবং শ্রীবাস্তব, ২০২৩)।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন ও মূল্য সংযোজন ঃ

সমৃদ্ধ পলিমাটি, জলের প্রাচুর্য এবং উপযুক্ত কৃষি জলবায়ু পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের মধ্যে সবচাইতে বেশি উৎপাদনশীল রাজ্যে পরিণত করেছে। এখানে প্রচুর পরিমাণে ধান ও ভুট্টার চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত জেলায় ধান চাষ হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বর্ধমান, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগণা এবং কোচবিহার। পশ্চিমবঙ্গে সুগন্ধি গোবিন্দভোগ চাল খুব বিখ্যাত। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর প্রভৃতি ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা সমৃদ্ধ জায়গায় ভুট্টার চাষ হয়। ভুট্টা হাঁস, মুরগি ইত্যাদির খাবার হিসেবে (পোলট্রি ফিড) ব্যবহৃত হয়। তাছাড়াও এটি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানার একটি মূল উপাদান। ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে, ফসল চাষে বৈচিত্র্য আনতে এবং প্রান্তিক চাষীদের আয় বৃদ্ধি করতে ভুট্টা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে।

বাকী অংশ পরবর্তী সংখ্যায়